ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

৩১ আগস্ট ১৯৭৯





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন ।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সে একমাত্র বাঙালী অ্যাথলিট
রীতা সেন /পাহাড়ী রায়চৌধুরী



ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ১৭ ।। ৩১ আগস্ট ১৯৭৯

ইডেন উদ্যানে গত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতে একটি প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের রূপ নিয়েছে—এ বিষয়টি হয়ত সাধারণ ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। রঞ্জি স্টেডিয়ামের আকার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ক্রিকেট মাঠে অধিক সংখ্যায় দর্শক আসন হয়েছে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সুবাদে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি অনুপম ইনডোর স্টেডিয়ামকে নিয়ে ভারত ও পশ্চিম বাংলা গর্ব করতে পারে। নতুন বামফ্রণ্ট সরকার বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সময় সাময়িকভাবে নির্মিত ক্ষুদিরাম হলকে কিছুদিন আগে আমূল সংস্কার করে একটি আধুনিক ক্রীড়াকেন্দ্রে রূপায়িত করেন। বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত ক্ষুদিরাম স্টেডিয়ামে সারাবছর টেবল টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন ও জিমন্যাস্টিকস অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

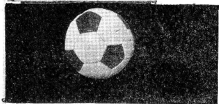
পশ্চিমবঙ্গের বামফণ্ট সরকার – নির্মিত রঞ্জি স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে আচ্ছাদিত ক্রিকেট অনুশীলনের কেন্দ্রটি ইডেন উদ্যানের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নবতম সংযোজন। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের ব্যবস্থাপনায় কংক্রিটের পিচের ওপর অ্যাসট্রোটার্ফ পেতে সারাবছর অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রটিতে ফাস্ট বোলিং করার জন্য মেশিন বসানো হবে এবং হলটিও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভাল খেলতে হলে সারাবছর অনুশীলনের ব্যবস্থার যে অভাব ছিল—তা এবার দূর হল। নিয়মিত অনুশীলন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নির্ভর করবে কেন্দ্রটি নির্মাণের সার্থকতা।

একই সঙ্গে আগামী কয়েকবছরের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে, ক্রিকেট খেলার সাফল্যের পথে অন্তরায় কি।—খেলোয়াড়দের মানসিকতা, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, সংকীর্ণ দলাদলি ইত্যাদি। বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের কাছে একটা বিষয় বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন এসব কিছুই ছিল না, ছিল না লিগ ও নক আউট ক্রিকেটের ব্যবস্থা—ক্রিকেট খেলার ক্লাবের সংখ্যা হাতে গোনা যেত—সেই ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলে ছিলেন পঙ্কজ রায়, স্বর্গত পি সেন (খোকন) এবং এন চৌধুরী (পুঁটু)







সম্পাদক : অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০

বিমান মাশুল :

পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

যা আছে

ফুটবল :

বিশেষ রচনা :

ছোটদের পাতা :

অন্যান্য :

প্রচ্ছদের ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ

কার্টুন : রাজা, আলি

ছবি তুলেছেন : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, অমিয় তরফদার, সমর তরফদার, শঙ্কর নাগ দাস প্রমুখ।



কে বলেছে—কলকাতার ফুটবল-মান নেমে যাচ্ছে

প্রদীপ ব্যানার্জি

একটা কথা প্রায়শই লোকমুখে শুনি যে 'কলকাতা ফুটবলের স্ট্যাণ্ডার্ড নীচে নামছে।' মন্তব্যটা ডাহা ভুল তা আমি হরদম বলে থাকি। তর্কাতর্কিও হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। আমার বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি দেখান যে কলকাতার লিগে খেলা নামী ফুটবলাররা বিদেশের প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে যাচ্ছে-তাই ফল করে। এবং তাতেই প্রমাণ হয় —আমাদের ফুটবল মান নীচে নামছে। এসব যুক্তি যারা মেনে নেন, তারা বরাবরই ভাল ফলের উপর চোখ রেখেই মন্তব্য ছোঁড়েন। বাইরের প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেরা কেন ভাল ফল করতে পারে না, সেই সম্পর্কিত কারণগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। কলকাতা ফুটবলের মান নীচে নামার সঙ্গে ওই কারণগুলোর সঙ্গতি খুঁজে বের করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়।

আসলে এই কলকাতায় আমাদের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচুর দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা তার বিচার করা কষ্টকর ব্যাপার। কারণ যেকোন জায়গার ফুটবল খেলার ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে কিনা তার আঁচ পাওয়া সঠিকভাবে সম্ভব লিগ প্রতিযোগিতা থেকেই।

আমরা যেভাবে লিগ খেলি তাতে শুধু লক্ষ্য থাকে চ্যাম্পিয়নশিপ দখলের বিষয়টা। আর এই চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই-এ আমরা মেতে থাকি শুধু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিং-কে ঘিরে। হৈ চৈ, গুজব গুঞ্জন এবং উল্লাসে-বিষাদে ১০২ দিনে এই যে এবারে ৪৬৩টি ম্যাচ খেলা হল লিগে, তাতে ফুটবল মানের সূক্ষ্ম বিচারের মানসিকতা কার থাকে! গত এক বছরে আমাদের ছেলেরা কতটা এগোলো তার বিচার কে বা কারা করবে! কে চ্যাম্পিয়ন হল, আর কারা কারা অবনমনের খাঁচায় পড়ল তাই নিয়েই তো এক বছরের ফুটবল লিগ শেষ হয়।

কলকাতার ফুটবল লিগের পদ্ধতির নড়চড় না হলে কখনোই সম্ভব হবে না খেলার মান বিচারের। হবে না তীব্র প্রতিযোগিতাও; প্রতিযোগিতা যত তীব্র হবে ততই বোঝা যাবে আমরা ফুটবলে কতটা এগোচ্ছি বা নামছি।

গত কয়েক বছরের মধ্যে এবারেই লিগে লড়াইগুলো হয়েছে খুব ভাল। তিনটে বড় দল ছাড়াও এবারে ছোটরা তৈরি ছিল। তাছাড়া ওরা এবারে প্র্যাকটিসের সময়ও পেয়েছে বেশি। এবছর ভাল খেলোয়াড়দের ডিভিসন হওয়ায় লড়াইগুলোতে তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে। গতবছর নামী খেলোয়াড়দের বেশির ভাগ জড়ো হয়েছিল মোহনবাগানে। কিন্তু এবছরে ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোট দলে নামীরা ছড়িয়ে যায়। যেমন সালকিয়া, টালিগঞ্জ অগ্রগামী প্রভৃতি দলে।



কলকাতা ফুটবলের পরিচিত দৃশ্য—'ছোট দলের' (ইস্টার্ন রেল : খিদিরপুর) খেলায় হাল্কা গ্যালারি/শঙ্কর

এ বছরের গোড়া থেকেই শুধুমাত্র ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের সমর্থকরাই নয়—সাধারণেরও চোখ ছিল ইস্টবেঙ্গল দলটির দিকে। কাগজে কলমে ওই দলই ছিল লিগ পাবার প্রথম দাবিদার। কিন্তু তারা আশানুরূপ ফল করতে পারেনি।

১৯৭৯-র লিগ টেবলের দিকে তাকালে দেখা যায় গত এক দশকে এবারের লিগই খানিকটা অন্যরকম হয়েছে। এবারে পনের/ষোল পয়েন্টেই অবনমন ঘটেছে। গড়াপেটার জন্য অনেককে অনেক পয়েন্ট ছাড়তে হয়েছে। আবার আরও লক্ষ্য করার বিষয়, চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান পেয়েছে ৪৩ পয়েন্ট। রানার্স ইস্টবেঙ্গল তিন পয়েন্ট কম এবং তৃতীয় স্থানের দখলদার মহমেডান স্পোর্টিং পাঁচ পয়েন্ট কম পেয়েছে। কিন্তু চতুর্থ স্থান পেয়ে এরিয়ান দখল করেছে মাত্র ২৮ পয়েন্ট।

লিগ মরশুম শুরুর আগেই এক দৈনিকে লিখেছিলাম যে, চারটি করে দলের ওঠানামায় কোন ভাল কাজ হবে না। লিগ শেষেও তাই বুঝছি। যারা নামল বা উঠল, তাদের মধ্যে ভারসাম্যের তফাত বড় বেশি।

সত্যিকারের প্রথম ডিভিসন যদি রাখতে হয়, তবে দল কমানোই অত্যন্ত জরুরী কাজ। এছাড়া ছোট দলগুলোর অনেকেই প্রচণ্ড অসহায় অবস্থায় পড়ে। এদের মধ্যে অর্থের সমবন্টন দরকার।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর কোনো শহরে এত প্রতিভাবান ফুটবলার থাকতে পারে না যাতে ২৩টা দল প্রথম ডিভিসনে খেলতে পারে।

এবছরে অবনমনের খাঁড়া পড়েছে মূলত অফিস দলগুলোর উপরই। ব্যতিক্রম শুধু ভ্রাতৃ সংঘ। পরিষ্কার হয়েছে—অফিস দলগুলোর বিরুদ্ধে অন্যদের জেহাদ ঘোষণা হয়েছিল লিগের মাঝামাঝি সময় থেকেই।

আমার বক্তব্য: চারটে দল নামা এবং চারটের বদলে দুটো দলকে তোলার নিয়ম চালু করা দরকার। এবং এই নিয়মের পরেও ওই ছ'টা দলকে নিয়ে আবার লিগ খেলানো যেতে পারে। তবেই যোগ্য কারা তার বিচার সঠিক হবে। এই ব্যবস্থায় শেষের আসনটি পেলেও বোঝা যাবে যে, দলটি সঠিক যোগ্যতা অনুসারেই নেমেছে।

এই ব্যবস্থা ইউরোপের বেশ কয়েকটা জায়গায় আছে।

প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা আট থেকে ১২ হলে ফুটবলের মান বোঝা সহজ হয়। তবে ডাবল লিগে খেলে (দল যদি ১২ হয়) একটা দলের ২২টা ম্যাচে দলগত এবং ব্যক্তিগত পারফরমেন্স বোঝা সহজ। তবে মনে রাখা দরকার প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা চৌদ্দর বেশি যাতে কিছুতেই না হয়।

আর প্রথম ডিভিসনে কলকাতা ছাড়া জেলার দলগুলিরও অন্তর্ভুক্তি দরকার—

একথাটা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ের। জেলা-গুলিতে যেসব ফুটবল প্রতিভা থাকে তাদের পূর্ণ বিকাশের পথ আজও পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম ডিভিসন লিগে এই কলকাতায় ইস্ট-বেঙ্গল বা মোহনবাগান খেলে নিজেদের জনতার সাবাস-ধ্বনির পরিবেশে। কিন্তু জেলাগুলিতে তাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলতে দিলে নানারকম সারফেস, ভিন্ন এরেনা বা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দর্শকদের মাঝে পড়বে। এতে বোঝা যাবে কলকাতার ঘেরা মাঠ ছাড়াও জেলার মাঠে খেলে জয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। আমার মনে হয় যখন তখন যেকোন ছোট দল বড় দলগুলোকে আঘাত হানতে পারবে বেশি।

যেমন প্রথম ম্যাচেই জিমখানা পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ায় এবছরে বহু তারকা নিয়েও মহমেডান পাঁচ পয়েন্ট কম নিয়ে লিগ শেষ করতে বাধ্য হয়েছিল। ওই কাণ্ডটা না হলে মহমেডান স্পোর্টিং হয়ত সারা লিগে অন্যরকম ফল করত।

কলকাতার দলগুলোকে জেলায় জেলায় লিগ ম্যাচ খেলাবার বন্দোবস্ত করলে অনেক স্টেডিয়াম গড়ার দাবি প্রয়োজন হয়ে পড়বে এবং প্রচুর সংখ্যার মানুষজনযুক্ত হয়ে পড়ায় জেলাগুলিতেও ফুটবলের জন্য জাগরণ হবে। শুধু কেবল কলকাতা নয়—গ্রাম এবং জেলা শহরগুলির ফুটবল প্রতিভা সুযোগ পাবে উপরে ওঠার।

এখন কলকাতার লিগ যেভাবে চলছে তাতে ফুটবলের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টাটা কেমন তা বোঝাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা স্মরণ করতে হয় যে, 'সমস্ত শরীরকে বঞ্চনা করিয়া শুধু যদি মস্তকে রক্ত সঞ্চার করা হয়, তবে তাহার নাম প্রকৃত স্বাস্থ্য নহে।'

উনআশির লিগে জর্জ টেলিগ্রাফের নিচের দিকে নেমে যাওয়াটা উল্লেখযোগ্য। গোড়ায় যেমনটা আশা করা গেছল, তেমন ফল করেনি এরিয়ান এবং কালিঘাট। অবাক করেছে সালকিয়া, অন্যান্যবারের চেয়ে ভালো ফল করে। গত মরশুমের নয়জন রেগুলার প্লেয়ার দল ছেড়ে গেলেও নতুনদের নিয়ে খিদিরপুরের ফল অত্যন্ত ভালো। ইস্টার্ন রেলওয়ে দল খেলেছে আস্থা সহকারে। তবে চন্দ্র মেমোরিয়ালের নতুন নাম রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের প্রতি প্রত্যাশা আরো বেশি ছিল।

পোর্ট ট্রাস্ট এবং ভ্রাতৃ সংঘের নেমে যাওয়াটা বেদনাদায়ক। এই দু'টো দলেরই সত্তরের দশকে গড়ের মাঠে বড় অবদান ছিল। গত কয়েকবছর ধরে দু'টো দলই ভালো খেলে এবারে নেমে গেল দ্বিতীয় ডিভিসনে।

ব্যক্তিগতভাবে এই মরশুমে আরো ভালো খেলা উচিত ছিল দিনকর, নাজিব, মিহির ও বিদেশের।

অন্য রাজ্য থেকে যারা এবারেই এসেছিল, তাদের মধ্যে দেবরাজ, ফিলিপ, পায়াস এবং ডেভিড আস্থা জাগিয়েছে।

কলকাতার স্টারদের মধ্যে (যারা এখনও ইণ্ডিয়া খেলেনি) ভালো খেলেছে নাসির আহমেদ, সুভাষ রায়, মঈদুল ইসলাম, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, অশোক চক্রবর্তী, অমিত গুহ, সত্যজিৎ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রতাপ ঘোষ, তপন দাস, সমর ভট্টাচার্য এবং মানস ভট্টাচার্য। মানসের এতো উন্নতি অবাক করেছে। চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের ৯০ ভাগ ম্যাচের আক্রমণের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল মানস।

আরও বেশী প্রত্যাশা ছিল এরিয়ানের মোতি সিং, বিশ্বজিত ভট্টাচার্য এবং সমীর মুখার্জির কাছে। দেবাশিস রায় খুবই ভালো খেলেছে।



'বড় দলের' গোল পাওয়ায় আনন্দিত সমর্থকদের উল্লাস/পাহাড়ী

মনে রাখার মতো খেলেছে শঙ্কর ব্যানার্জি ও অশোকলাল ব্যানার্জি। দু'জনেই বয়সের ভার নিয়ে গড়ের মাঠে বিচরণ করছে। নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও দলকে নিষ্ঠার সঙ্গে চালনা করে এবং এই বয়সেও এতো ভাল খেলে সিনিয়র প্লেয়ারদের মধ্যে দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়েছে। টালিগঞ্জ দলটাই এ মরশুমে খুব ভালো খেলেছে। এমনটা খুব একটা দেখা যায় না।

বয়স হলেও বুদ্ধি ও পজিশনাল খেলা দিয়ে অশোকলাল প্রতিটি ম্যাচেই খিদিরপুর ডিফেন্সকে আগলে রেখে অবাক করেছিল।

খিদিরপুরের অমিত বাগচীকে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় দলে দেখলেও অবাক হবার কিছু নেই। একটু স্পিডের উন্নতি হলে ওর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। অমিত দুই প্রধানের বিরুদ্ধেও গোল করেছে।

সালকিয়ার অনেক পুরানো খেলোয়াড় হাজির ছিল। খেলেছে ভালো। গোল-কিপার অতনু ভট্টাচার্যের ভবিষ্যৎ ভালো। এই দলটি গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অবনমনের কোন ভয় নেই।

ইস্টার্ন রেলের প্রবীর তো ছিলই, সরল গাঙ্গুলী, রণবীর দাস, অরবিন্দ মুখার্জিও বেশ ভালো খেলেছে।

প্রথম বছরে বাইরের ছেলেরা এসে বি এন আরকে তেমন শক্তি দিতে পারেনি। স্থানীয়রা দল ছাড়ায় তাই বি এন আর লিগের মাঝপথে অনেক খেলায় মুস্কিলে পড়েছিল। শেষ দিকে চেন্না রেড্ডি দায়িত্ববান হওয়ায় তারা উৎরে যায়।

স্বাস্থ্য, গতি এবং গোল করার ইচ্ছা দেখে মনে হয়েছে মাথা গরম করে না খেললে রাজস্থানের কার্তিক শেঠ বড় খেলোয়াড় হতে পারবে।

কুমারটুলির তরুণ স্ট্রাইকার শক্তি মিত্র নজর কেড়েছে।

উনআশিতে লিগ মরশুম ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়াটাই ছিল মস্ত ব্যাপার। যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল শুরুতে এবং মাঝা-মাঝি সময়ে, তাতে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা নিয়ে দিন গুজরান করছিল কলকাতার সাধারণ নাগরিকরা। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকেও আবেদন জানাতে হয়েছিল।

যাই হোক, ভালোয় ভালোয় লিগ শেষ হওয়াতে বোঝা গেল শুভবুদ্ধির লোকজনের অভাব নেই। প্রয়োজনে তারা সব এগিয়ে আসতে জানে।

এবারে গড়ের মাঠে সরকারের আর্থিক সাফল্যও কম নয়। চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ক্রমাগত অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় তিন প্রধানের শেষ ম্যাচ পর্যন্তও দর্শক গ্যালারি ছিল ঠাসা।

আই এফ এ এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ বুক ফুলিয়ে তাদের সাফল্য দাবি করতে পারে।

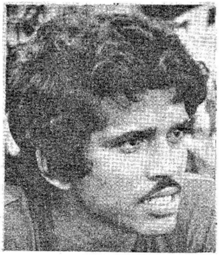
(অনুলেখক : দিলীপ সরকার)

মোহনবাগান-অধিনায়ক দিলীপ পালিত কি অসুস্থ ছিল,—না অসুস্থ বানানো হয়েছিল ?

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রশ্নটা নিয়ে কলকাতার ফুটবল মহল বেশ সোচ্চার—কিন্তু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তারা পায়নি। অথচ প্রশ্নটা যে খুব কঠিন তাও নয় ; কলকাতার ফুটবল-পাগল দর্শকরা জানতে চায় এবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলের অধিনায়ক দিলীপ পালিত কেন লিগের শেষ খেলায় ড্রেস করেও সারাক্ষণ সাইড লাইনে বসে রইল। কেন সে মাঠে ও তাঁবুতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ক্লাব পতাকা তুলল সহ-অধিনায়ক কম্পটন দত্ত। এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক —দিলীপ এ মরশুমে অধিনায়ক হয়েও কেন মাঠের বাইরে কাটাল বেশীর ভাগ ম্যাচে। দু-একটি ম্যাচে সে আদৌ মাঠেই এলো না। কেন ?

এ প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পেতে হলে সবার আগে যার শরণাপন্ন হতে হবে তিনি মোহনবাগানের কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি। কারণ দল গঠন, দল কিভাবে, কাকে নিয়ে খেলবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। এবং মোহনবাগানের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে পি কে'র অন্যতম শর্ত ছিল কেউ তার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

আজ এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারবেন না পি কে'র সেই অধিকারে কোন কর্মকর্তা, বা কোন খেলোয়াড় হস্তক্ষেপ করেছে বা করতে পেরেছে। এবং একথা পি কেও অবশ্যই অস্বীকার করবেন না। সব ক্লাবেই একটি টিম সিলেকশন কমিটি/সাব-কমিটি থাকে। তাতে সাধারণত কোচ, অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক, দু' একজন সিনিয়র খেলোয়াড় এবং ফুটবল সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক থাকেন। প্রতিটি খেলার আগের দিন এরা সবাই মিলে বসে ঠিক করেন পরের দিন ম্যাচে কে কে খেলবে। এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা মোহনবাগানেও আছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসে খুব স্বাভাবিকভাবে ; কোচ যদি বলে থাকেন তার নির্বাচন বা পছন্দই শেষ কথা তবে এমন কমিটির মূল্য কোথায় ? এবং স্বভাবতই এই কমিটির কোন গুরুত্ব ছিল না। যদি থাকত তাহলে পি কে'র গুরুত্ব কমত যা সম্ভবত তার কাছে কাম্য ছিল না। এবং যতদূর জানি মরশুমের মাঝামাঝি এই কমিটির কোন অস্তিত্বই ছিল না। পি কেই সব করতেন। এবং তিনি সফলও। মোহনবাগান ১৯৭৯ সালে লিগ চ্যাম্পিয়নও।



অকেজো কেন বললাম। প্রথম দু' তিনটি খেলায় কমিটির সবাই এসেছেন, স্বল্পক্ষণের গুরুত্বহীন মিটিং,কোচ তার লিস্ট অনুমোদন করাতে বেগ পাননি। কেউ ও নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু ক্রমে কোচ ওই মিটিং-এ আসতে দেরী করতে লাগলেন। তাকে ছাড়া মিটিং হয় না, অপেক্ষা করে কেউ কেউ চলে যান। অবশেষে খেলার দিন কোচই দল ঠিক করে (এককভাবে) মাঠে নামান। তারপর

কিছুই বলব না ঃ পি কে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মোহনবাগান অধি-নায়ক দিলীপ পালিত যে সব অভিযোগ করেছেন,—কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি-র বক্তব্য কী সে সম্পর্কে ? প্রদীপবাবু কোন মন্তব্য করেননি, করতে চানওনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানান, আমি কিছুই বলব না।

কোচ কাজের চাপে মাঠে আসেন না, অন্যান্যরা অনেক অপেক্ষার পর একখানা কাগজ হাতে পান—কোচ ১৬ জনের নাম পাঠিয়েছেন। পরদিন তাদের মধ্য থেকেই দল গঠন করা হবে এবং করবেন অবশ্যই কোচ পি কে। দুই খেলোয়াড় প্রতিনিধি প্রথমে মিটিং-এ আসা বন্ধ করে দিল। এক কর্মকর্তা বললেন, 'আসার কি দরকার, টিম আমরা ঠিক করে নেব—কোচ পি কে তো আছেই।' অতএব এক্ষেত্রে যা হবার তাই হোল।

দিলীপ সম্বন্ধে পি কে নানা সময় যে মন্তব্য করেছেন (ওর না খেলা নিয়ে) তাঁর মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য। যেমন—ও অসুস্থ তাই খেলতে পারেনি। ওর বুকে ফোঁড়া তাই মাঠে নামান সম্ভব হয়নি। এবং শেষ খেলার দিনের বক্তব্য : ও প্রথম এগার জনের মধ্যে আসে না, তাই মাঠে নামানোর প্রশ্ন ওঠে না।

এসব বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছেও। মোহনবাগান এবার প্রথম খেলে ভ্রাতৃ সংঘের বিরুদ্ধে। দিলীপ অধিনায়ক হিসাবে মাঠে নামল এবং খেলল। খেলল তারপর দুটি ম্যাচ উয়াড়ি ও পোর্ট ট্রাস্টের বিরুদ্ধে। কেমন খেলেছে দিলীপ ? খুব একটা ভাল খেলেছে এমন নয়। কিন্তু সমস্ত টিমটাই তো তখন নড়বড়ে। চোখে পড়বার মত খেলা তখনও কেউ খেলেনি। চতুর্থ ম্যাচে দিলীপ সুযোগ পেল না। কোচের ঘোষণা 'দিলীপ আন-ফিট।' ম্যাঝে একদিন দিলীপের সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম ; 'কেমন আছ, শুনলাম অসুস্থ খেলতে পারছ না।' 'কৈ না তো, আমি তো সুস্থই আছি।' দিলীপের সরল উত্তর। সেদিন দিলীপ সুস্থ থেকেও খেলতে পারেনি। এমন পর পর বেশ কয়েকটি ম্যাচে।

কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও সে খেলেছে ; একদিন দেখলাম ওর পায়ের পাতা ফুলে রয়েছে, চটি পরতেও কষ্ট হয়। সেই পা নিয়ে ও ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলেছে। খেলেছে তার আগের দুটি ম্যাচও। কেন খেলল ? টিমের স্বার্থে অবশ্যই। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা ও খেলেছে ওর নিজের জন্যই। ও চাইত খেলতে, আশা করত কোন অজুহাতে যেন কোচ ওকে সাইড লাইনে না বসান। কারণ ও খেলতে ভালবাসে। কিন্তু সারা সিজনে ও গোটা দশেক ম্যাচ খেলেছে। বাকি খেলায় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার পরেও কোচ পি কে বার বার বলেছেন— দিলীপ অসুস্থ। একেবারে শেষ খেলায় বলেছেন 'অপ্রত্যাশিত একটি কথা, দিলীপ প্রথম ১১ জনের মধ্যে আসে না। তাই যদি হয় তাহলে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের মত দুই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দিলীপকে কেন নামালেন কোচ পি কে ? অবশ্যই দিলীপ বড় ম্যাচে অপরিহার্য ছিল। তা না হলে পি কে ওকে নামাবেন কেন ?

২১ জুলাই 'এর পর দিলীপকে আর মাঠে নামানো হয়নি। ১৩ আগস্ট এরিয়ানের বিরুদ্ধে মাঠে নামানো গেল না। ক্লাবের একজন প্রাক্তন সিলেক্টর ও প্রখ্যাত খেলোয়াড় কোচকে অনুরোধ করেছিলেন 'এটা তো প্রায় একটা ফেস্টিভ্যাল ম্যাচ, ক্যাপ্টেনকে খেলাও।' কোচ উত্তর দিলেন—'টিম যদি ২/৩ গোল

জেতে তখন দেখা যাবে—এখন রিস্ক নেওয়া সম্ভব নয়।' পি কে রিস্ক নেননি, তার দল ৩-১ গোলে জিতেছে। এর পরের মুহূর্তে অভিনীত হোল আর এক নাটক। কোচ পি কে অধিনায়ক দিলীপকে বললেন - ক্লাব পতাকা তুলতে। অভিমানী ও অত্যধিক ভাবপ্রবণ অধিনায়ক সম্মত হলেন না। পি কে চলে গেলেন। দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও সিনিয়র খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্য এসে দিলীপকে অনুরোধ করায় দিলীপ জল ভরা চোখে এগিয়ে গেলেন পতাকা তুলতে। কিন্তু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরও আঘাত, কোচের নির্দেশে সহ অধিনায়ক কম্পটন তার আগেই পতাকা তুলেছেন। দিলীপের চোখের জল তখন আর বাধা মানেনি।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন কোচ জেনেশুনে কেন সবাইকে মিথ্যা বললেন? পি কে'র উত্তর হয়ত হবে, দিলীপ খেলতে পারেনি প্রথম থেকে, ও যাতে হেয় না হয়, দুঃখ না পায় তার জন্য ওই মিথ্যার আশ্রয় নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কে তাকে বাধ্য করেছিল ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে দিলীপকে মাঠে নামাতে? অবশ্যই দিলীপের খেলা। তার চেয়েও বড় কথা—কোচ পি কে মোহনবাগানে এসেছেন ১৯৭৬ সালে। দিলীপ এই টিমে খেলছে ১৯৭৫ থেকে। তিন বছরের খেলার নিরিখে পি কে উনআশি সালে টিম গঠনের সময় দিলীপকে চেয়েছিলেন কি? যতদূর জানি তার ও কর্মকর্তাদের ইচ্ছা ছিল দিলীপকে ছেড়ে সত্যজিৎ মিত্রকে নেওয়া। সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার পরেই দিলীপকে অধিনায়ক করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাবে রাখা হয়। কিন্তু কেন? পি কে যদি বুঝে থাকেন—দিলীপের আর খেলা নেই, মোহনবাগানের এই টিমে ও এগারজনের মধ্যে স্থান পেতে পারে না তবে কেন তাকে রাখা হোল? রাখা হয়েছিল—কারণ দিলীপের যথাযোগ্য পরিবর্ত টিমে কেউ ছিল না।

তাহলে দিলীপকে কেন বঞ্চিত হতে হল? এর একমাত্র উত্তর পি কে তার ক্ষমতার 'সদ্ব্যবহার' করে জেদ বজায় রেখে কলকাতার ফুটবলের ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখেছেন। কি সেই জেদ?

'৭৮-এর কথা। পি কে মোহনবাগানে এসেও সাফল্য পাচ্ছেন। একটি বিরল নজির সৃষ্টি করতে চাইলেন তিনি। টিম কোন ম্যাচে গোল খাবে না লিগের খেলায়। কিন্তু গোল খেল, এক অদ্ভুত অবস্থায়। খিদিরপুরের বিরুদ্ধে খেলা। মোহনবাগানের তিনজন ডিফেণ্ডারকে অনড় করে দিয়েছিল গোলপোস্টের পিছন থেকে আসা একটি তীব্র বাঁশির আওয়াজ। ওরা ভাবল বুঝিবা অফসাইডের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি। কিন্তু ওটা যে কত বড় ভুল তা খেলোয়াড় বুঝতে পারল রেফারির মুখের বাঁশিটি গোলের নির্দেশ দেওয়ায়। এই যখন পরিস্থিতি, তার কিছু পরে কোচ পি কে মাঠ ছাড়লেন— যতদূর পারলেন খেলোয়াড়দের বকলেন। সতের-আঠার মিনিট তখনও খেলা বাকি। টিম ৩ গোলে এগিয়ে। কোচের উদভ্রান্ত ব্যবহারে সবাই মর্মাহত। সহ-অধিনায়ক দিলীপ কোচের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল 'কেন আপনি মাঠ ছেড়ে চলে এলেন। এতে তো আমাদেরও খারাপ লাগে, মন ভেঙ্গে যায়। আপনি থাকলে আমরা মনে বল পাই।' কোচ এমন 'উপদেশ' মেনে নিতে পারেননি। দু'চার কথা চালাচালি হোল দু'জনে—সেই শুরু। কোচ বললেন—'কি করে তুমি চান্স পাও দেখে নেব।' এবং দিলীপের অভিযোগ : তিনি দেখালেন। শিল্ডের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ ও আরারাতের বিরুদ্ধে দিলীপ মাঠে নামার সুযোগ পেল না। কোচ কি তখনই মনে করেছিলেন দিলীপ প্রথম ১১ জনে স্থান পায় না?

ডুরাণ্ড খেলতে মোহনবাগান গেল দিল্লিতে। দলের সঙ্গে কোচ পি কে তখনও যাননি। তিনি কলকাতা থেকে খেলার আগের দিন টেলিফোনে নির্দেশ দিতেন কে মাঠে নামবে। এই নির্দেশে দিলীপের নাম উহ্য থাকত। দিলীপ যখন বুঝল তাকে খেলানো হবে না, সে হাবিবের মত সিনিয়রদের কাছে জানাল, সে কলকাতায় ফিরে যাবে। দিলীপ ফিরে এল। সঙ্গে এলো কম্পটন দত্ত। সেও ক্ষুব্ধ, সেও চেয়েছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। এদিকে কোচ তখন দিল্লি গিয়ে পৌঁছেছেন। তিনি খবর পাঠালেন কলকাতায়—'দিলীপ না আসুক কম্পটনকে পাঠানো হোক'। দিলীপকে ডাকা হোল না। কম্পটন ডাক পেয়ে দিল্লি গেল। দিলীপ তাকে তুলে দিয়ে এলো প্লেনে। অবশ্য এক্ষেত্রে অন্যতম এক কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দিলীপকে বলেছিলেন; 'আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোর একা যাওয়া ঠিক হবে না।' কিন্তু আত্মীয় বিয়োগে তিনি তার কথা রাখতে পারেননি। '৭৮-এ ডুরাণ্ডে মোহনবাগানের ফল কি হয়েছিল তা সকলেই জানেন।

এল '৭৯। দিলীপের ভাগ্য অপরিবর্তিত। ক্লাবের অর্থাৎ কোচের মনোভাব জেনে সে চাইল দল ছেড়ে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হোল না। তাকে দলে রাখতে সুব্রত ভট্টাচার্য অনেক করেছে। কিন্তু আশ্চর্য—এই নবু অধিনায়কের সঙ্গে দল গড়া নিয়ে কোন আলোচনাও কেউ করেনি।

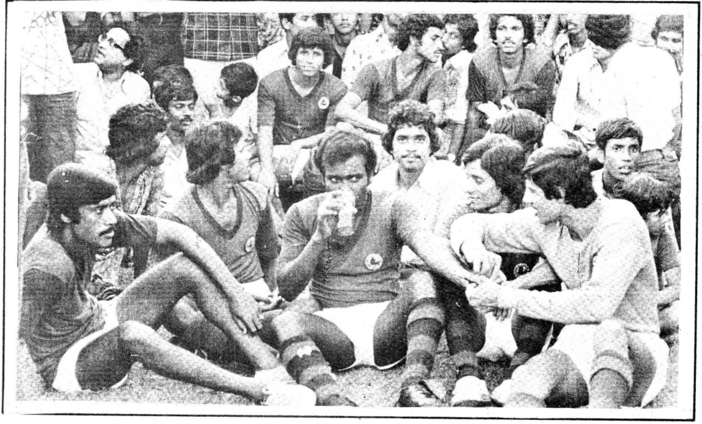
যাই হোক, দল গড়া হয়ে যাওয়ার পর দিলীপ 'খেলার আসর'কে বলেছিল—অতীতের সব কথা আমি ভুলে গেছি, প্রদীপদার সঙ্গে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। দিলীপের এই মনোভাবকে পি কে স্বাগত জানাতে পারেননি বলেই মরশুমের শুরু থেকে লড়াই ঘোষণা করলেন। দিলীপের স্থান হল সাইড লাইনের পাশে। ওখানে প্রায় পাকাপাকি স্থান করে নিল স্বপন নন্দী, সন্তোষ বসু, সমর ভট্টাচার্য।

সাত জুলাই তারিখে কলকাতা ফুটবলের সেই অনন্য আকর্ষণ মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল খেলা দিলীপ খেলল। কিন্তু বেশ কিছুদিন বসে থাকায় এবং মন ভেঙ্গে যাওয়ায় দিলীপের খেলা খুব উঁচু পর্যায়ে উঠল না। তবুও তার কর্তব্য সে করেছে নিজের দায়িত্ব পালন করে। সেই প্রবাদটির মান রাখল সে সুরজিৎকে অকেজো করে। কিন্তু সম্পূর্ণ দলটি সেদিন ব্যর্থ হোল। মোহনবাগান খেলল এক ছন্নছাড়া খেলা। কেন?

পি কে আজ পর্যন্ত কোন কাগজের লোককে ডেকে দিলীপের প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। দিলীপও তার টিম বা কোচ সম্বন্ধে কিছু বলতে নারাজ। তবে 'খেলার আসরে' কোচ পি কে তার সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে দিলীপকে প্রশ্ন করলে ও বলেছিল—'দেখুন কোন বিবৃতি, কোন মন্তব্য নয়। তবে প্রদীপদা যখন সাত তারিখের 'ঘটনা' নিয়ে ইঙ্গিত করেছেন তখন ঘটনাটা একটু বিস্তৃত করা ভাল। সাত তারিখে আমরা যে খেলা খেলেছি তাতে আমরা সকলে লজ্জিত। আমাদের সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। খেলা শেষে ক্ষোভে দুঃখে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলে গত এক মাসে যে কথা বলতে পারিনি তাই মুখ ফুটে বলেছিলাম কোচকে। বলেছিলাম—'মে মাসের শেষ থেকে আপনি যদি মেঘালয়ের স্কুল টিম নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত না হতেন, তাহলে এমন ফল হয়তো হোত না।' আসল ব্যাপারটা খুলে বলি। মেঘালয়ের একটি টিম বাইরে খেলতে যাবে প্রদীপদা তার কোচিং-এর দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং আপনারা জানেন যদি টিম যেত তাহলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার দিন প্রদীপদা কলকাতা থাকতে পারতেন না। কিন্তু খেলার আগে একমাস উনি ভোর ৬টা থেকে ওদের কোচিং দিতেন আমাদের মাঠে। আমরা সাড়ে সাতটা, আটটায় এসে মাঠের এক কোণে নিজেরা বল নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। তারপর কোচ একসময় আমাদের দিকে নজর দিতেন। মাঠে তখনও স্কুল ছেলেরা। প্রচণ্ড গরমে প্রায় ন'টার সময়ে প্র্যাকটিস শুরু। ভাবতে পারেন? কোচ নিজেও তখন

→

মোহনবাগানের লিগের শেষ খেলায় (এরিয়ানের বিপক্ষে) খেলোয়াড়- দর্শক কেষ্ট মিত্র, তপন দাস, উলাগানাথন, স্বপন নন্দী ও সন্তোষ বসু (মাটিতে) অধিনায়ক দিলীপ পালিত পিছনের সারিতে পাশেই সমর ভট্টাচার্য ও ছেত্রী / শঙ্কর নাগ দাস



পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। এমন প্রতিদিন। অনেকেই এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলেনি। আমি বলেছিলাম—এবং তাতেই আমাকে অনেক কথা শুনতে হোল। কোচ রায় দিলেন ; আমি খেলতে জানি না, খেলার কিছু বুঝি না। আমি জানি না সে ঘটনায় আমার অন্যায় কোথায় ছিল ? টিমকে ভালবাসি। টিমের স্বার্থে দলনায়ক হিসাবে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি মনে করি সে অধিকার আমার আছে।'

'তোমার বিরুদ্ধে দলের ও কোচের অভিযোগ কি ?'

'আমি জানি না, আমাকে কেউ কোনদিন জানায়নি।' দিলীপের উত্তর।

ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অভিযোগ কি ? ও উত্তর দিল—'কিছুই না, আমি খেলতে পারলেই খুশী, তাই বলে এমন নয় যে আমি খেলতে না পারলেও দলকে ডোবাতে আমাকে মাঠে নামাতে হবে। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি দলের স্বার্থে আমি সাইড লাইনে বসতে রাজি আছি। কিন্তু মিথ্যা বলে আমার ফুটবল জীবন শেষ করা হচ্ছে কেন ? আমি অসুস্থ এমন একটা ছলনার আশ্রয় নেওয়া হল কেন ?'

'তুমি তোমার এই ক্ষোভের কথা কর্মকর্তাদের জানিয়েছ ?'

'জানিয়েছি—তারা বলেছেন ব্যাপারটা দেখবেন।'

'এর পিছনে কি কারণ আছে বলে তুমি মনে কর ?'

'আমি জানি না কি কারণ থাকতে পারে।'

আসলে দিলীপ পালিত হতভাগ্য, সে প্রচণ্ড ক্ষমতাবান কোচের বিরূ নজরে পড়েছে। কোচ চান না তার সামনে কেউ মাথা তুলে কথা বলুক। দিলীপ তা বলেছে তাই সে অবাধ্য। কিন্তু মানসিক দিক থেকে আজ প্রায় প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবাধ্যতা আড়ালে আবডালে প্রকাশ পাচ্ছে। আরও দু'চারজনের হয়তো বা সোচ্চার হবার সময় এসেছে। এসব ব্যাপার দেখে মনে পড়ে মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক শঙ্কর ব্যানার্জির কথা— সেও রাগে ও ক্ষোভে দল ছেড়েছিল—পি কে সবাইকে খেলালেও 'পেলে-ম্যাচে' তাকে দু'মিনিটের জন্যও মাঠে নামাননি। সেখানেও কি যোগ্যতার প্রশ্ন ছিল, না ব্যক্তিগত জেদের ব্যাপারটাই ছিল পি কে-র সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ?

দিলীপ অনেকের কাছে বলেছে—'আমি আর পারছি না, খেলা ছেড়ে দেব।'

সত্যিই সে খেলা ছাড়বে কিনা তা সেই জানে। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে (ক) কেন পি কের মত এমন কোচ বার বার মিথ্যার আশ্রয় নিলেন ? খ) ৭৯-র দল গঠনে তাকে অগ্রাহ্য করেই কি দিলীপ পালিত, স্বপন নন্দী, সমর ভট্টাচার্যকে দলে আনা হয়েছিল ? গ) শেষ খেলা এরিয়ানের সঙ্গে, সে খেলায় অধিনায়ক দিলীপ পালিত ১০/১৫ মিনিটের জন্যও খেলতে পারে এমন অবস্থায় ছিল না কি ? ঘ) বলা হয়েছে সে প্রথম ১১ জনের মধ্যে আসে না, এটা কবে থেকে কোচ উপলব্ধি করতে পেরেছেন ? ঙ) দিলীপ যে কটা ম্যাচে খেলেছে তাতে তার অপদার্থতা কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে ? চ) কোচ পি কে দিলীপকে তার ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করেও কি ব্যর্থ হয়েছেন ? ছ) অধিনায়কের অবাধ্যতা প্রসঙ্গ কি কোচ কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরেছেন কখনও ? জ) কর্মকর্তারা দিলীপের অভিযোগকে কেন আমল দিলেন না ? তারা কি দিলীপকেই দোষী ও অবাধ্য মনে করেন ? ঝ) সিলেকশন কমিটি কি দিলীপ পালিতের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোচের মতকেই মেনে নিয়েছেন ?

সবশেষে জানতে ইচ্ছা করে মোহনবাগান দলের নেপাল সফরে যাবার কথা অধিনায়ককে জানান হয়নি কেন ? একজন অধিনায়ককে জানতে হোল একজন সাধারণ সমর্থকের কাছে। অধিনায়ক জানে না তার দল বাইরে যাচ্ছে ! ১৯ তারিখে যাবার কথা যখন ঠিক তখন ১৭ তারিখ রাতেও দিলীপকে কেউ জানায়নি কেন ? জানি না দিলীপকে নেপালে যাবার জন্য বলা হবে কিনা—যদি না বলা হয় তবে তা দিলীপের নয় ক্লাবেরই কলঙ্ক।

এই পরিবেশেও দিলীপ এখনও ক্লাবে আসে, প্র্যাকটিস করে যায় নিয়মিত। যতই বলুক খেলা ছেড়ে দেব ও কিন্তু চায় যতদিন পারে খেলা নিয়ে থাকতে, বাঁচতে।

Cornhill Insurance Test Series

তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করেছিল ভারত

লিডস থেকে বাল পণ্ডিত

(মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন রঞ্জি প্লেয়ার, বর্তমানে ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিক)

লর্ডস টেস্টের শেষে একথা স্বীকার করতে হয়েছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্বনাথ-বেঙ্গসারকর সেঞ্চুরি করলেও খেলার সময় যদি বৃষ্টির জন্য সীমিত না হত, ম্যাচ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জেতবার একটা সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু হেডিংলে মাঠে তৃতীয় টেস্ট দেখবার পর সে রকম চিন্তা করার কথা মনে হয়নি।

এই খেলাটিতে ফলাফল হবে না—সেটি শুরু শনিবার বৃষ্টির সময়ই বোঝা গিয়েছিল। তবে যা ক্রিকেট খেলা, দেখে মনে হল—ভারত শেষ টেস্টের জন্য যথেষ্ট মনোবল পেয়েছে নিশ্চয়। এমন মনে করবার দুটি কারণ আছে। প্রথমত এই খেলাতেই ভারত এই সিরিজে প্রথম ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করতে পেরেছিল। ঘাউড়ি যখন সোমবার সকালে র‍্যানডলকে বোল্ড আউট করে, তখন ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন। ইয়ান বোথাম দলকে সেই অবস্থা থেকে রক্ষা করে বটে, তবে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং যে তেমন শক্তিশালী নয় এটি সকলের মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভারত ব্যাট করবার সময়ে মঙ্গলবার সকালে বিশ্বনাথ যখন আউট হয়, তখন স্কোর ছিল তিন উইকেটে বারো রান। আমাদের অনেকেরই ভয় হচ্ছিল, আবার সেই ৪২ অল আউটের মতন না হতে চলে! কিন্তু যশপাল খুবই ভাল খেলে, আর প্রায় মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত গাভাসকরকে চমৎকার সাপোর্ট দেয়। যশপালের ব্যাটিং যেমন আমাদের আশা দেয়, তার থেকে এটাও পরিষ্কার হয়, মাথা নামিয়ে গুছিয়ে খেললে এই ইংল্যাণ্ডের বোলিং-এর বিরুদ্ধে অনেক ভারতীয় ব্যাটসম্যানই মোটামুটি দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

দারুণ মারমুখী ব্যাটিং-এর জন্য বোথাম অনায়াসে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। সে যতক্ষণ উইকেটে ছিল সে সময়ে মোট ২০৬ রান যোগ হয়, আর বোথামের ভাগ তার মধ্যে ১৩৭। যাকে ইংরাজিতে বলে 'হিটিং হিজ ওয়ে আউট অফ ট্রাবল্' বোথাম ঠিক তাই করে। এমন করতে যথেষ্ট সাহস দরকার বটে, আর দরকার চোখের তৎপরতা, নিখুঁত ব্যাটিং-এর সাহায্যে বলের লাইনে গিয়ে খেলার ক্ষমতা। আর সোমবার বোথামের খেলায় এই দুটি গুণ পুরোভাবে আমরা দেখতে পেলাম। তবে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, পিচ থেকে ভারতীয় স্পিনাররা তেমন সাহায্য পাচ্ছিল না,



তৃতীয় টেস্টের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' বোথাম

আর কপিলদেব এদিন একেবারেই ভাল বল করতে পারেনি।

কপিলের বল ম্যাচের প্রথম দিনে আরো অনেক বেশী ধারালো ছিল। বয়কট অবশ্য একটা খারাপ সট মেরে আউট হয়, আর গুচ বা ব্রিয়ারলি দুজনেই আউট হয় স্লিপে দুটি ভাল ক্যাচ ধরা হয় বলে। ক্যাচ ঠিক মতন ধরতে পারলে দল নানাভাবে সাহায্য পায়।

ডেভিড গোয়ার প্রথম টেস্টে দ্বি-শতরান করেছিল। লর্ডসেও প্রথম প্রথম কিছুটা সময় আনচান করার পর সুন্দর স্ট্রোক নিয়েছে। তবে তার ব্যাট চালানোর কায়দা বেশ আকর্ষণীয় হলেও মুস্কিল আসানের জন্য ঠাণ্ডা মাথায় খেলার অভিজ্ঞতা তার এখনও হয়নি। শেষ ইনিংসে যেমন শূন্য রানের মাথায় তার বিরুদ্ধে এল-বি-ডবলিউ অ্যাপিল হয়, এবারও ঠিক তাই। তবে এবার গোয়ার ছাড়া পায়নি ঃ বাইশটি ইনিংসে এই তার প্রথম টেস্টে 'গোল্লা'।

বৃষ্টি যখন শুক্রবারের খেলা পুরোপুরি ভেস্তে দেয়, প্রেসবক্সে অনেকেরই চিন্তা ছিল রবিবারের খেলা নিয়ে। লিডস থেকে মাইল ষোল দূরে হ্যারোগেটে ইংরেজ সাংবাদিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের ম্যাচ। সুব্রত সরকার দেশে ফিরে গেছে, মানব মজুমদার লণ্ডন থেকে আসেনি, আমাদের দলকে পাকিস্তানের কামার আমেদ (প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার আর বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট অ্যানুয়ালের সম্পাদক) সাপোর্ট দেবে শুনে সাহেবরা মোটেই খুশী হয়নি।

তবে বৃষ্টি যখন চলতে থাকে, তখন ইংল্যাণ্ড, ভারত দুজনেরই ভবিষ্যৎ টেস্ট সিরিজ সম্পর্কে আলোচনা হয়। নভেম্বরে ইংল্যাণ্ড পূর্ণ শক্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারবে কিনা সে নিয়ে ইংরেজ সাংবাদিকদের যথেষ্ট সন্দেহ।

অপরদিকে আমাদেরও সন্তুষ্ট হওয়ার মতন কোনই কারণ নেই। শেষদিনে বেঙ্গসরকর লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসে যেমন টেকনিক আরমনোযোগ দিয়ে খেলেছিল সেই গুণ আবার প্রদর্শন করে। তাছাড়া যশপালের ব্যাটিং যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের চিন্তা স্পিন বোলিং নিয়ে। চন্দ্রকে দলেই আনা যায় না, বেদী যেন একটু হারিয়ে গেছে। আর জন আর্লট প্রমুখ যতই এখানকার কাগজে বেদীর কলা-কৌশলের গুণগান চালিয়ে যাক না কেন, আমরা মনেপ্রাণে জানি বিষেণ সেই আগের বোলার নেই। বেদীকে ইংরেজ সাংবাদিকরা চাইছে ব্যাটসম্যানদের সুবিধের জন্য।

আরেকটি জিনিস আমাকে বিশেষভাবে চিন্তিত করেছে। এই সিরিজের পাঁচটি ইনিংসে সুনীল গাভাসকর রান করেছে যথাক্রমে ৬১, ৬৮, ৪২, ৫৯ আর ৭৮। গড়ে ইনিংস প্রতি প্রায় ৬২ রান। কিন্তু গাভাসকরের মতন ব্যাটসম্যান, যার রান ক্ষুধা আমরা এতবছর লক্ষ করে এসেছি, শতরানের কাছে অবধি পৌঁছাচ্ছে না কেন? সোমবার মনে হচ্ছিল সে দারুণ ওয়েল-সেট, কিন্তু হঠাৎ সে এডমণ্ডসের মতন স্পিনারের বলে আউট হয়। লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসে সে প্রায় তার উইকেট ছুঁড়ে ফেলেছিল। এসবের সহজ উত্তর, গাভাসকরের কনসেনট্রেশন হয়ত আগের মতন নেই। হয়ত সে ওভালে সেঞ্চুরি করবে, করে আমাদের সবাইকে আবার তার রানের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে।

তাই মনে করি বেঙ্গসরকর বা যশপালের ব্যাটিং বিশেষ করে খারাপ আলোতে থেকে আমরা আশা রাখতে পারি। তাদের মতন প্লেয়াররা যদি বিশ্বনাথ আর গাভাসকরকে ভরসা দিতে পারে, তাহলে ওই শ্যালক-ভগ্নিপতি জুটির উপর চাপ কম হবে। হয়ত তার ফলে তাদের দুজনের ব্যাটিংই আরও সফল হবে।

লিডসে লিভারের বদলে সুস্থ বব উইলিস আবার দলে ফেরে। তবে বোথামের সাফল্য সত্ত্বেও আমার এখনও ধারণা, এই ইংল্যাণ্ড দলের একমাত্র সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর বোলার মাইক হেণ্ড্রিক। এমন অ্যাটাকের বিরুদ্ধে একটু ধরে খেলার ধৈর্য দেখাতে পারলে ভারত ওভালে ভালই করবে।

স্কোর

ইংল্যাণ্ড

প্রথম ইনিংস

জিওফ বয়কট ক বিশ্বনাথ বো কপিলদেব	৩১
ব্রিয়ারলি ক বিশ্বনাথ বো অমরনাথ	১৫
গুচ ক বেঙ্গসরকর বো কপিলদেব	৪
গাওয়ার এল বি ডবলিউ বো কপিলদেব	০
র‍্যানডল বো ঘাউড়ি	১১
বোথাম ক ঘাউড়ি বো বেঙ্কটরাঘবন	১৩৭
মিলার ক রেড্ডি বো অমরনাথ	২৭
এডমণ্ডস রান আউট	১৮
টেলর ক চৌহান ব বেদী	১
উইলিস অপরাজিত	৪
হেণ্ড্রিক ক পরিবর্ত ব বেদী	০
অতিরিক্ত	২২
মোট	২৭০

উইকেট পতন ঃ ১/৫৩, ২/৫৭, ৩/৫৭, ৪/৫৮, ৫/৮৯, ৬/১৭৬, ৭/২৬৪, ৮/২৬৪, ৯/২৬৬।

বোলিং ঃ কপিলদেব ২৭-৭-৮৬-৩, ঘাউড়ি ১৮-৪-৬০-১, অমরনাথ ২০-৭-৫৩-২, বেঙ্কটরাঘবন ৭-২-২৫-১, বেদী ৪-৫-২-২৫-২।

ভারত

প্রথম ইনিংস

গাভাসকর বো এডমণ্ডস	৭৮
চৌহান ক বোথাম বো উইলিস	০
অমরনাথ ক টেলর বো উইলিস	০
বিশ্বনাথ ক ব্রিয়ারলি বো হেণ্ড্রিক	১
যশপাল ক বোথাম বো মিলার	৪০
বেঙ্গসরকর অপরাজিত	৬৫
কপিলদেব ক গুচ ব মিলার	৩
ঘাউড়ি অপরাজিত	২০
অতিরিক্ত	১৬
মোট (৬ উইকেটে)	২২৩

উইকেট পতন ঃ ১/১, ২/৯, ৩/১২, ৪/১০৪, ৫/১৬৫, ৬/১৬০।

বোলিং ঃ উইলিস ঃ ১৮-৫-৪২-২, হেণ্ড্রিক ১৪-৬-১৩-১, বোথাম ১৩-৩-৩৯-০, এডমণ্ডস ২৮-৪-৫৯-১, মিলার ৩২-১৩-৫২-২, গুচ ৩-১-২-০, বয়কট ২-২-০-০।

ক্রিকেটের দলবদল ঃ লাভবান এরিয়ান, ক্ষতি হল স্পোর্টিং ইউনিয়নের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ক্রিকেটের দলবদল শুরু হয়েছে ২০ আগস্ট, চলবে এক মাস ধরে। প্রথম দিনেই অধিকাংশ নামী ক্রিকেটার দল বদল বা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর তৃতীয় দিন হয়েছে আর একটি উল্লেখযোগ্য সই—অলোক ভট্টাচার্যের ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে যোগদান।

ফুটবলের দলবদলকে কেন্দ্র করে যে বিরাট ভিড়, তুমুল উৎসাহ, উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়, ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে তেমন কিছুই হয় না ঠিকই। তবে ইদানিং বড় দলের সদস্য, সমর্থকরা ক্রিকেটের দল পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামান।

দল বদলের তৃতীয় দিনে ক্লাব হাউসের গেটের সামনে ছোটখাটো দু-একটা জমায়েত দেখলাম।

আগেই লিখেছি, প্রথম দিনেই অধিকাংশ সই বা প্রত্যাহার সাঙ্গ হয়েছে। গতবারের লিগ ও পি সেন ট্রফি বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলকে দিয়েই শুরু করা যাক। ইস্টবেঙ্গল এবার স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে গোপাল বসু এবং মোহনবাগানের সুব্রত গুহকে পেয়েছে। দলের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করেছে পলাশ নন্দী, রবি ব্যানার্জি, ফারাসাতুল্লা, অমিতাভ রায় ও দেবু মিত্র। সম্বরণ ব্যানার্জি অবশ্য এখনও উইথড্র করেনি। দল ছেড়েছে বরুণ বর্মন, রাজা মুখার্জি এবং অলোক ভট্টাচার্য। বরুণ বা রাজার অন্য দলে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ইস্টবেঙ্গল থেকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দলত্যাগ ঘটেছে অলোক ভট্টাচার্যের। তবে দুই অভিজ্ঞ সুব্রত গুহ ও গোপাল বসু'র যোগদানের ফলে ইস্টবেঙ্গলের গতবারের শক্তি, আমার ধারণায় খুব একটা ক্ষয়ে যায়নি।

গতবারের নক আউট মোহনবাগানের সবচেয়ে বড় লাভ নিঃসন্দেহে অলোক ভট্টাচার্যকে পাওয়া। অলোক এই মুহূর্তে বাংলার সেরা অলরাউণ্ডার হিসাবে বিবেচিত। এছাড়া মোহনবাগান পেয়েছে এরিয়ান থেকে সুব্রত পোড়েল এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রণব রায়কে। সুব্রত পোড়েল সুব্রত গুহ'র ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে দিতে পারবে বলে আমার মনে হয়। টিমের পক্ষে নাম উইথড্র করেছে প্রণব নন্দী, প্রবীর চেল, প্রলয় চেল ও মলয় ব্যানার্জি। গতবারের অধিনায়ক রাজু মুখার্জি অবশ্য এখনো উইথড্র করেনি। দু'দলের মধ্যে লড়াইটা আগামী ক্রিকেট-সিজনে জমে উঠবে আশা করা যায়।

এবারের পালা বদলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অবশ্যই স্পোর্টিং ইউনিয়ন। গোপাল বসু, প্রণব রায়, ভেঙ্কটরমনরা দল ছেড়েছে। ওদের আপাতত একমাত্র লাভ কালিঘাটের অভীক মিত্রকে পাওয়া। সি এ বি ক্রিকেটে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও কালিঘাটের এক সময় যে দাপট ছিল, এখন আর তা নেই। কালিঘাট শুধু অভীককেই নয়, অরূপ ভট্টাচার্যকেও হারিয়েছে।

এ বছরের দল পরিবর্তনে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে অবশ্যই এরিয়ান। সুব্রত পোড়েলকে হারালেও এরিয়ান ঘর ভরিয়েছে ইস্টবেঙ্গল থেকে বরুণ বর্মন ও রাজা মুখার্জি, মোহনবাগান থেকে প্রবাল ঘোষ, কালিঘাট থেকে অরূপ ভট্টাচার্য ও বালিগঞ্জ ইউনাইটেড থেকে রাজেশ দানীকে নিয়ে। এছাড়া উদয়ভানু ব্যানার্জি ও গৌতম গুপ্ত উইথড্র করেছে। ওই ব্যাপারে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই, সি এ বি লিগ, নক আউট, পি সেন ও জে সি মুখার্জি ট্রফিতে এরিয়ান এবার ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগানের দিকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বে।

রাজস্থান আপাতত একটি বড় দাঁও মেরেছে মোহনবাগানের সমর চক্রবর্তীকে দলে পেয়ে।

শুনছি, মহমেডান নাকি বাইরে থেকে দু-একজন নামী টেস্ট তারকা এনে দলকে সমৃদ্ধ করছে।

(২৩ আগস্ট পর্যন্ত)

ভারতে অস্ট্রেলিয়ার খেলা

সেপ্টেম্বর ঃ

১-৩	ঃ শ্রীনগর	ঃ উত্তরাঞ্চল
৬-৮	ঃ হায়দ্রাবাদ	ঃ দক্ষিণাঞ্চল
১১-১৬	ঃ মাদ্রাজ	ঃ **প্রথম টেস্ট**
১৯-২৪	ঃ বাঙ্গালোর	ঃ **দ্বিতীয় টেস্ট**
২৭-২৯	ঃ নাগপুর	ঃ মধ্যাঞ্চল

অক্টোবর ঃ

২-৭	ঃ কানপুর	ঃ **তৃতীয় টেস্ট**
৯-১১	ঃ আমেদাবাদ	ঃ পশ্চিমাঞ্চল
১৩-১৮	ঃ দিল্লি	ঃ **চতুর্থ টেস্ট**
২১-২৩	ঃ কটক	ঃ পূর্বাঞ্চল
২৬-৩১	ঃ কলকাতা	ঃ **পঞ্চম টেস্ট**

নভেম্বর ঃ

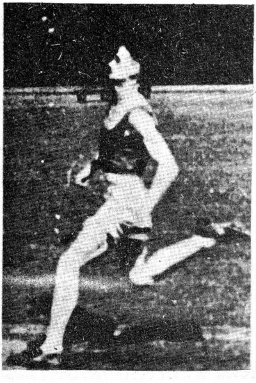
৩-৮	ঃ বোম্বাই	ঃ **ষষ্ঠ টেস্ট**

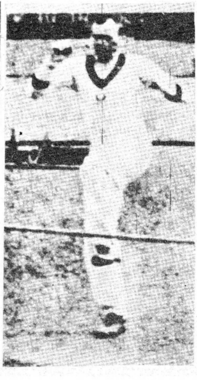
কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (১১)

স্বরাজ ঘোষ ঃ বিভিন্ন বিষয়ের খেলা নিয়েই বিশ্ব ওলিম্পিকের আসর বসে। তার মধ্যে সবচেয়ে কৌলীন্য অ্যাথলেটিক্সের। এই কৌলীন্য বোধহয় এখনও বজায় আছে। তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অ্যাথলেটিক্স ছাড়া কেবলমাত্র অন্য বিষয়ে ওলিম্পিকে যোগদান করার অধিকার নেই। ধরা যেতে পারে কেবলমাত্র হকি দলই ওলিম্পিকে যোগদান করবে। কিন্তু তার সঙ্গে অন্তত একজন অ্যাথলিটকে সঙ্গে নিয়ে যোগদান করতে হবে। তা না হলে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি দলের স্থান হবে না। এটা আমরা ১৯২৮ সালের ওলিম্পিক থেকে শুনে আসছি। এর কারণ হয়ত এই হতে পারে যে অ্যাথলেটিক্স-ফিটনেস ছাড়া কোন খেলাতেই সাফল্য লাভ করা যায় না, বিশেষত ফুটবলে তো নয়ই। তার উপর আধুনিক ফুটবলে এর প্রাধান্য এখন সর্বাগ্রে। এই মনোভাব নিয়ে যখন লিখছি, তখন নিশ্চয়ই ছবি দিয়ে বোঝান দরকার মনে করেছি। বিশেষত ফুটবলের সঙ্গে অ্যাথলেটিক্স-এর প্রত্যক্ষ মিলন বা যোগ কোথায়। সেই সূত্রে কতকগুলো অ্যাথলেটিক্স বই-এর প্রয়োজন হয়। বিশেষত ছবির প্রয়োজনে, সেই সুবাদে আজ জানাতে লজ্জা হচ্ছে এই বলে যে আমরা খেলাধূলার উন্নতির পরিবর্তে কত পিছিয়ে গিয়েছি। ক্রীড়া জগতে ইউ বি রয় (উবেরয়), পাইওনিয়ার স্পোর্টস, জে কে স্পোর্টস-এর মত উচ্চশ্রেণীর ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকান সকলেরই জানা। সেই দোকানগুলোতে সম্প্রতি অ্যাথলেটিক্স বই-এর জন্য ঢুকি ও উক্ত বই-এর কথা বলি। উক্ত দোকানগুলো অ্যাথলেটিক্স বই-এর পরিবর্তে আমার হাতে অ্যাথলেটিক্স-এর আইন কানুনের বই তুলে ধরে। তখন তাদের আমি জানালাম, এটা তো আইনের বই। অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন বিষয়ের বই কি আছে? উত্তরে তারা জানালেন, এই বইয়েরই এখন চাহিদা। ওই বইয়ের চাহিদা নেই। আমি আগেই লিখেছি বর্তমানে অ্যাথলেটিক্স অবহেলিত। এবার আরও জানা হয়ে গেল, অ্যাথলেটিক্স বর্জিত ও যারা ফুটবলের উন্নতির নাম করে উন্নতির নামাবলী গায়ে চড়িয়ে চিৎকার করছেন ও ক্রীড়া সমাজে প্রশিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস ছাড়াই এগোচ্ছেন। তা না হলে বাজারে আজ অ্যাথলেটিক্সের বই নেই কেন?

এবার আবার সতের বছর পিছিয়ে যাচ্ছি। তখন বিদেশে দেখে এসেছি ছেলেদের জন্য এমনকি পরিণতদের জন্য কত রকমের প্র্যাকটিসের জুতো। সেই জুতো পায় দিয়ে সব বয়সের খেলোয়াড়ই স্কিলগুলো অনুশীলন করতে পারে। আর ১০—১২ বছরের ছেলেদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তাদের জন্য রাবার ও প্লাস্টিকের স্টাডওয়ালা কেটস জুতো আছে। যা পায়ে দিয়ে পরিণত খেলোয়াড়গণও ফুটবল খেলতে পারে। এছাড়া জার্মানির 'আদিদাস' বুটের কথা তো ক্রীড়া জগতে খুবই পরিচিত। ওই ধরনের কয়েকটি জুতো বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। যাতে আমাদের দেশেও তৈরি করানো যেতে পারে। আমি সেই চিন্তা করে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাবার ধরনের এক জুতো কোম্পানির সঙ্গে আলাপ করি। তারা জানিয়েছিলেন, ফুটবল খেলার মত মজবুত করে (চামড়া ও রাবার—প্লাস্টিক সোলের সঙ্গে) কমপ্রেসার মেসিন নেই। ভেবেছিলাম এই কয় বছরে স্পোর্টস কাউন্সিল ও জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনের দাবিতে আমরা সেই ধরনের জুতো বাজারে দেখতে পাব বা বাটা ও ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মত রাবারের জুতো কোম্পানির তৈরি ওই ধরনের জুতো বাজারে দেখতে পাব। কিন্তু দেখছি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আসরে আমাদের চরম ব্যর্থতার পরও ব্যাপকভাবে ক্রীড়ামান উন্নয়নের বাস্তব চেতনাবোধ আসেনি বা কার্যকর করার কোন সৎপ্রচেষ্টাও দেখছি না।

যাই হোক, বাজারে যে ধরনের জুতো আছে, তাই নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। সেকথা আগেই লিখেছি। এবার আরম্ভ করছি ব্রড জাম্পের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে। প্রথম পর্বে লিখেছি 'টেক অফ বোর্ড' বা জাম্প চিহ্ন থেকে লাফ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে। এবার লিখছি, লাফ দেওয়ার পর কি ভঙ্গিমায় ল্যাণ্ড করতে হয়। সব সময়ই কল্পনা করতে হবে







—ফুটবলের জন্যই ওইসব করা হচ্ছে। তা হলে এই লাফ থেকে আমরা কি কি শিখতে পারি? সবরকম গতির উপর তাৎক্ষণিক মাটি ঘেঁষা সট, উঁচুতে সট (ইনসুইং, আউট সুইং, টরনেটো ইত্যাদি)। আরেকটা সট এই লাফের মাধ্যমে জন্মায়। সেটা হল কোমর অবধি লাফিয়ে স্ট্রেট ফুল ভলি। তার উপর হলেই স্ট্রেট ভলি হয়না। সেই অবস্থাটি থাকে হেড ও ফুল ভলি! সেই ভলির কথা পরের সংখ্যায় আসব। তারজন্য আছে অন্য ধরনের জাম্প।

স্ট্রেট ফুল ভলির কতকগুলো অনুশীলন আছে। সেটা রড জাম্পের দ্বিতীয় পর্বে আসে। যেমন ল্যাণ্ড করার আগে জাম্প পিটেতে হাইজাম্পের মত পিটের দুইদিকে দুটো পোস্ট বসিয়ে দুই-আড়াই-তিন ফুট উঁচু করে একটি বাম্ব দিয়ে তার উপর জাম্প অনুশীলন করতে হয়। আবার মাথায় চিন্তা রাখতে হবে যে কাল্পনিক ভলি মারা হচ্ছে। ক্রমাগত এই অনুশীলনে এই স্ট্রেট ফুল ভলির ক্ষমতা জন্মায়।

এই সংখ্যায় তিনটি ছবি দেওয়া হল প্রথমটি : টেক্ অফ বোর্ড থেকে জাম্প হচ্ছে। দ্বিতীয়টি : ল্যাণ্ড করার আগে যে উচ্চতা বারটি দেওয়া আছে তাকে জাম্প করে অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়টি : বার অতিক্রম করার পর ল্যাণ্ড করতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ স্ট্রেট ফুল ভলি মারার ভঙ্গিমায়।

(চলবে)



ওরাও মানেন—

বিনু চ্যাটার্জি : কুসংস্কার, অজ্ঞতা, কোন কিছু সম্বন্ধে যুক্তিহীন ভয় বা ভক্তি প্রায় অধিকাংশ মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু থাকে। কারো বেশী, কারো কম। কারোর সেটা প্রকাশ পায় কারো বা সেটা প্রকাশ পায় না। এটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত এমন কি গরীব মানুষদের মধ্যেও আছে। বিজ্ঞানী, ডাক্তার, সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রতারকারাও এর থেকে রেহাই পান না। রেহাই পান না ফুটবল খেলোয়াড়রা, কোচ, কর্মকর্তা এমন কি সরকারী চাকুরে বড় বড় অফিসাররাও। আরো আশ্চর্য বড় খেলার আগে পুলিশ অফিসাররাও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে মাঠে প্রবেশ করেন। কেউ বা বেটন বা টিয়ারগ্যাসের গানটা নমস্কার করে মাঠের ধারে বসে খেলা দেখেন। সুপারটিশনে কোন বয়সের বাধা নেই। নয় থেকে নব্বুই বছর বয়সের সকলের মধ্যেই দেখা গেছে এই 'রোগ'টা। এখন দেখা যাক এই মরশুমে লিগ বিজয়ী মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা ও কোচ কে কি সুপারসটিশন মেনে চলেন। তার আগে আমি আমার ন'বছরের মেয়ের কথা বলি। তাকে নিয়ে চলেছি এস-১৭ বাসে করে কলেজ স্কোয়ার সাঁতার প্রতিযোগিতায়। ব্যাক স্ট্রোক ইভেন্টে সে নাম দিয়েছে। পি জি হাসপাতালের পাশ দিয়ে যখন বাসটা চলছে তখন হঠাৎ বলে উঠল বাবা বাড়ি চল, আজ সাঁতারে কিছু হতে পারবো না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? উত্তর পেলাম, রাস্তায় এক শালিক দেখলাম। দুটো দেখলে তবে তো 'টু ফর জয়'। আমি কিন্তু তাকে এটা কুসংস্কার বলে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। ও কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে দুটি শালিক দেখার আশায়। কিন্তু দেখতে পায়নি। আশ্চর্য সে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিছুই হতে পারেনি। এবার বলি ইস্টবেঙ্গলের কোন এক খেলায়। প্রায় নব্বুই বছরের এক বৃদ্ধ তার নাতিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ দিয়ে কে যেন হেঁচে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, আজ ইস্টবেঙ্গল হেরে যাবে, ঢোকার মুখেই বাধা! সেই খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল ৪—০ গোলে।

কাকে নিয়ে শুরু করবো, অধিনায়ক দিলীপ পালিত না কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি। না থাক, শুরু করা যাক নামের লিস্ট যেভাবে নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকে। তাই শুরু করি গোলকিপার প্রতাপ ঘোষকে নিয়ে। প্রতাপ এই মরশুমে মোহনবাগানের একজন নির্ভরযোগ্য গোলকিপার। সে খেলার দিন ঠিক তিনটেয় টেন্টে ঢোকে। টেন্টে ঢুকেই সে প্রথমে প্রসূন ব্যানার্জিকে একবার দেখে নেবে। তারপর অন্য কাজ। এটাই ওর সুপারসটিশন। কম্পটন টেন্টে আসে ঠিক একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। টেন্টের মাঝখানে বড় টেবিলে কম্পটন একটা তোয়ালে পেতে তার উপর শুয়ে থাকবে। এর কোনদিন ব্যতিক্রম হবে না। অন্য বিশেষ তুকতাক ওর নেই। সুব্রত টেন্টে ঢোকে ৩-৩০ মিনিটে তবে সে যেখান থেকেই আসুক একবার মোহনবাগান মেস থেকে ঘুরে আসতেই হবে। শ্যামল ব্যানার্জি কি করে? ও খেলার দিন সকালে কালীবাড়ি যাবেই এবং বিকালে খেলার আগে মা কালীর সিঁদুরের টিপ অবশ্যই পরবে। ও টেন্টে আসে একটা তিরিশ মিনিটে। এসেই সম্পাদকের ঘরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তোয়ালে পরে বসে থাকবে। জায়গা বদল হয়েছে বলে জানা নেই। প্রদীপ চৌধুরীর সুপারসটিশনটা খুবই প্রকট। তিনটে তিরিশ মিনিটে সে মাঠে পৌঁছয় এবং মোহনবাগান লেখা মাঝের গেট দিয়েই সে দৈনিক ঢুকতে চায়। বড় খেলার দিন সে মুস্কিলে পড়েছিল।' ওই গেট বন্ধ ছিল পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। প্রদীপ কিছুতেই অন্য গেট দিয়ে ঢুকবে না। তাই সে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেও যখন সেই গেট খোলা গেল না তখন বাধ্য হয়েই প্রদীপকে অন্য গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে সে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। টেন্টে ঢুকে সে সারাক্ষণই খুঁত খুঁত করেছে ওই নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকতে না পারায়। দিলীপ পালিতের সুপারসটিশনটা একটু অন্য ধরনের। প্রায় আধ ডজন নতুন



ফুটবল মোজা পাওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে তুলে রেখে দিলীপ একটা ছেঁড়া মোজা পরে মাঠে নামবে। ছেঁড়া জায়গাগুলোকে সেলাই করে পরের ম্যাচে আবার ওটা পরেই মাঠে নামে। এটাই ওর লাকি মোজা। আর একটা মজার ব্যাপার বাড়ি থেকে মাঠে আসার আগে ও ওর স্ত্রীর হাতে এক গ্লাস জল খাবেই। এতে ব্যতিক্রম হয় না। গৌতম সরকার কি করে? ও কিন্তু সকলের শেষে টেন্টে আসবে। ৩-৪৫ মিনিট। দৈনিক সেঁকা রুটি আর চা খাবে। অন্য কিছু দিলেও গৌতম কিন্তু খাবে না। তাই মনে হয় ওই সেঁকা রুটি আর চা গৌতমের সুপারসটিশন। প্রসূন ব্যানার্জি ১৯৭৪ সাল থেকে মোহনবাগানে খেলছে। এবং ওই সাল থেকেই সে চারটি ছেলে তপন, গৌতম, খোকা, তপু এদের নিয়ে মাঠে ঢুকবে, এর ব্যতিক্রম হলে প্রসূন কেমন যেন খুঁত খুঁত করে। দ্বিতীয়ত ও নিজে হাতে কোনদিন জার্সি নেয় না। মোহনবাগানের পুরানো মালি ভাসিয়া জার্সিটা এনে প্রসূনকে দেবে তবেই ও পরবে। মরশুমের অন্যতম টপ স্কোরার মানস ভট্টাচার্য কি করে? মানস আসে ১-৩০ মিনিটে। টেন্টে ঢুকেই প্রথম কাজ মা কালীর ছবিটা ভক্তিভরে নমস্কার করা। তারপর চলে যাবে



সম্পাদকের ঘরে। তিনটে থেকে তিনটে তিরিশ মিনিটের মধ্যে সে একটা টেলিফোন করবেই। ওই সময় ওই টেলিফোন করতেই হবে। শ্যামের কিন্তু ওসব নেই। ও পিছনের গেট দিয়ে ঢোকে এবং নীল রঙের র‍্যাংলার গেঞ্জি পরে খেলার দিন মাঠে আসে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি। জেভিয়ার পায়াস তিনটে তিরিশ মিনিটে মাঠে আসে। বাদামী রঙের একটি বিদেশী ব্যাগ ওর হাতে দেখা যাবেই খেলার দিনে। খেলার সরঞ্জাম তাতে থাকুক বা না থাকুক। বিদেশ বসুর কিন্তু সংস্কার অন্যরকম। বিদেশ সাড়ে তিনটেয় মাঠে আসে। খেলার সরঞ্জামগুলি নিজে গুছিয়ে নিয়ে টেন্টের মাঝখানে লম্বা টেবিলের উপর বসবে। সকল খেলোয়াড়ের বুট যেমন মালিরা কালি করে রাখে বিদেশের কিন্তু সেটা চলবে না। সে নিজে হাতেই কালি করবে, তা না হলে মন খুঁত খুঁত করে। খেলার আগে সে বুট, মোজা, জার্সি এমনকি বাইকটাও নমস্কার করে।

এদের যিনি পরিচালিত করেন সেই কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিকে কিন্তু লিগের প্রায় সবকটি খেলায় দেখা গেছে এক প্যান্ট ও এক সার্ট পরে মাঠে আসতে। মাঠে আসার আগে বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালী দর্শন করে আসা চাই। ১৯৭২ সাল থেকেই দেখা গেছে তিনি পরে আসেন রু ক্রেপের জুতো। জুতোটা ছিঁড়ে গেলে তাতেই তালি দিয়ে দিয়ে চালাচ্ছেন। আর কতদিন চালাবেন জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন যতদিন চলে চলুক।

ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের খেলোয়াড় ও কোচদের নিয়ে এ ধরনের লেখার চেষ্টা করবো।

অন্যচোখে

ব্যাসদেব ঃ কিম হিউজেসের অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরের জন্য মাদ্রাজে এসে পৌঁছবার পর এই দেশ সম্পর্কে তাকে আগে ভাগেই কিছু অন্তত জানিয়ে দেওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু সেদিন তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছিল ভবানীপুর টেন্টে। লিগ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর শিল্ড শুরু না হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছিল সে। আমি কথাটা পাড়তেই তাই হাঁ হাঁ করে উঠল ও, এটা এমন কি ব্যাপার যে হিউজেসকে এখনই বিরক্ত করতে হবে?

তাকে বললাম, দেখ, দশ বছর আগে বিল লরির অস্ট্রেলিয়া দল শেষবার ভারত সফর করে যখন—তখনকার এবং তার আগে ও পরের ঘটনা হিউজেসের না জানারই কথা। অতিথিকে বিপদে ফেলা আমাদের ধর্ম নয়। তায় এই ছোকরা আর তার দলবল এখানে একেবারে নতুন। আমাদের কি উচিত নয় ওদের জানানো যে দশ বছর আগে তাদের ক্রিকেট-পূর্বপুরুষ বিল লরি এই কলকাতায় ছবি তুলতে চাওয়ায় এক ফটোগ্রাফারকে ব্যাট পেটা করে হাতের সুখ করে নিয়েছিল। হিউজেসেরও ওরকম কিছু প্ল্যান থাকলে সেটা ত্যাগ করাই ভাল। যেহেতু অনেক ফটোগ্রাফারই এখন ব্যাগে অনেক কিছুর সঙ্গে লাঠিও রাখে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের জন্য।

সেই সাংবাদিক বন্ধুটি ঘাপটি মেরে বসে থাকলেও আমার কথাগুলো যে সে শুনে যাচ্ছে তা তার চোখ দেখেই বুঝলাম।

হোটেল থেকে দমদম এয়ারপোর্ট যেতে রাস্তায় লরির ছোট ছোট পাহাড় দেখার কথাও ভাব। দেশে ফিরে লরি বলেছিল, গাড়ি বার বার সেই পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিল। হিউজেসকে কি আমাদের জানিয়ে রাখা ভাল নয় যে 'হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট নয়, হোটেল থেকে টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব অথবা রেসকোর্স যেতে চাইলে রাস্তায় পাহাড় দেখতে পাবে সে। এবং দেশে ফিরে বিল লরির দৃষ্টিশক্তি নিয়ে একটা প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়ে বাড়তি পাবলিসিটি অনায়াসেই পেয়ে যাবে সে।

সাংবাদিক বন্ধুটি আরও গুম মেরে গেলেও আমি কিন্তু চালিয়ে যেতে লাগলাম। দশ বছর আগে ভারতের ক্রিকেট মাঠগুলোয় ফেন্সিং টপকানো ব্যাপারটা ছেলেদেরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এখন মেয়েরাও যে পিছিয়ে নেই—কালীচরণের টিম খেলতে আসার পর সেটা মালুম হয়ে গেছে। হিউজেস আর তার বেশীর ভাগ ব্যাচেলার সঙ্গীর পক্ষে এই দিক থেকেও এই সফর যে গুরুত্বপূর্ণ সেটাও তাকে একবার বলা দরকার নয় কি?

কলকাতায় টেস্ট ম্যাচের সময় রেডিও-টেলিভিসনে যাদের রিলে করতে ডাকা হবে তাদের কেউ যদি অশ্লীল কথাবার্তা বলে মাইকের সামনে এবং হিউজেস বা তার কোনো সঙ্গীর সম্পর্কে মন্তব্যগুলি ব্যবহৃত হয়, তবে তা ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রককে তৎক্ষণাৎ জানানোর পরামর্শও হিউজেসকে দিয়ে রাখা ভাল।

তর্ক করার নেশা ছুটে যাওয়ায় সেই সাংবাদিক বন্ধুটি সরে পড়ার ভান করলেও টেন্টের গেট অবধি ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করলাম। অন্তত আর একটা বিষয় হিউজেসকে বলে নেওয়া ভাল। সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বললাম, অস্ট্রেলিয়া টিম কলকাতায় খেলা বাদে আর যা কিছু করবে তার একটা লিস্ট হোটেলের দরজায় টাঙিয়ে রাখা উচিত। সেই সঙ্গে, যে যা বলবে তাও। যাতে কোন একজন সাংবাদিক গুলতাপ্পি চালিয়ে যেতে না পারে। যেমন চালিয়েছে লয়েড, গ্রেগ, কি কালিচরণের টিম খেলতে আসার সময়।

কর্ণাটক মোটর র‍্যালি আফ্রিকান সাফারির মত বিপদসঙ্কুল



১০০০ মিঃ মোটর র‍্যালিতে বিজয়ী বাঁদিক থেকে জনার্দন রাজু, মহেশ রেড্ডী, দয়ানন্দ মান্দ্রে এবং প্রদীপ দেশাই

বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দম ঃ এবারের কর্ণাটক মোটর র‍্যালিতে বাঙ্গালোরের র‍্যালিয়িস্টরা দু চাকা আর চার চাকার উভয় ধরনের গাড়ির প্রতিযোগিতাতেই বিজয়ীর সম্মান ও বিরাট আর্থিক পুরস্কার লাভ করেছে।

'প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট' গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন দয়ানন্দ মান্দ্রে, সহকারী চালক ছিলেন মহেশ রেড্ডী, নেভিগেটর ছিলেন জনার্দন রাজু ও প্রদীপ দেশাই। সবচেয়ে কম পেনাল্টি পয়েন্ট দিয়েছে এই দলটি, ৫৮৪০ পয়েন্টে তারা চার চাকার গাড়ির দৌড়ে প্রথম হয়ে 'মাইকো' ট্রফি ও দশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পান।

দুই সাহসী তরুণ বি এন ইয়েতিশ ও কে সি শেখর 'ইয়েজদি' মোটর সাইকেল নিয়ে দু চাকা যানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এদের মধ্যে চালক ছিলেন ইয়েতিশ আর নেভিগেটর কে সি শেখর।

এবারের র‍্যালির জন্য যে পথ ঠিক করা হয়েছিল, সেটা বন্ধুর এবং প্রতিযোগীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তবু প্রতিযোগিতার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। মোটর সাইকেলের আরোহীদের হাঁটু পর্যন্ত ডুব জলে পিচ্ছল ভূমির ওপর দিয়ে একসময় পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

মান্দ্রের দল গত চার বছর ধরে একসঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। মান্দ্রে বলছিলেন, তাদের যাত্রাপথের প্রথম পর্যায়, বাঙ্গালোর থেকে সিমোগা, মোটামুটি নির্বিঘ্নে কেটেছে, একবার শুধু একটি টায়ার বদলাতে হয়েছিল। তার পরবর্তী দীর্ঘ পথ সিমোগা থেকে মাঙ্গালোর অভিযানে তাদের কিছু সময় নষ্ট হয়, ফলে অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে সাকলেসপুর, কে আর নগর, মালান্দ, কণকপুরা হয়ে ফিরতি পথের যাত্রায় তাদের গাড়ির গতিবেগ ৮০ থেকে ১০০ কিমি-র মধ্যে রাখতে হয়েছিল। এই পর্যায়ে এ্যাক্সলেরটরের গোলযোগে তাদের খানিকটা ভুগতে হয়। অবশেষে ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা ষোলো মিনিটে সমাপ্তি রেখায় পৌঁছান।



মোটর র‍্যালিতে দু চাকায় বিজয়ী বি এন ইয়েতিশ ও কে সি শেখর / ছবি জে আনন্দরাজ

বিজয়ী প্রতিযোগী দয়ানন্দ মান্দ্রে বলেছেন, পেট্রল নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি, অন্যান্য ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। কলকাতার ভরত পারেখ এদেশের র‍্যালিয়িস্টদের মধ্যে প্রথম সারির নাম। শ্রীপারেখের মতে কর্ণাটক র‍্যালি ইস্ট আফ্রিকান সাফারির মতই বিপদসঙ্কুল ও তীব্র উত্তেজনাকর।

দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন কোয়েম্বাটুরের করি বর্ধন, প্রতাপ জয়রাম, অরুণ রাও ও গোবিন্দরাজুলু-র দল। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান পান যথাক্রমে অরুণ দিরাজিলাল ব্যাঙ্কার, জীবন কুমারের দল ও জে দধিওয়ালা ও তার দল।

মোটর সাইকেল প্রতিযোগিতায় ইয়েতিশ ও শেখর একটি বিশেষ প্রতিযোগী নম্বর প্লেট উদ্যোক্তাদের কাছে চেয়েছিল। গত দুটি প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার কারণ হিসাবে, তাদের ধারণা, অপয়া প্রতিযোগী-নম্বর তারা পেয়েছিল। এবারে তাদের নম্বর ছিল ৮৮। অপয়া নম্বর পেয়ে প্রথমবার তারা ভাঙা শক এ্যাবজর্বার নিয়ে চতুর্থ হয়েছিলেন। এবার পছন্দসই নম্বর পেয়ে তারা প্রথম হয়েছেন। পথে মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশের কোন ত্রুটির জন্য এবার তাদের ভুগতে হয়নি।

এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল কর্ণাটক মোটর স্পোর্টস ক্লাব। ●

ফুটবল—ওলিম্পিকে

অতীন সরকার ঃ ইতিহাস কেমন করে এগিয়েছে? ১৮৯৬ সালে এথেন্সে গ্রীক ও ডেনিস দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হয়। ডেনিস দল স্বর্ণপদক ও গ্রীক দল রৌপ্যপদক পায়। চার বছর পরে প্যারিস ওলিম্পিকে তিনটি দলের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণ, বেলজিয়াম রৌপ্য ও ফ্রান্স ব্রোঞ্জ পদক পায়। পরবর্তী তৃতীয় ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কানাডার সেণ্ট লুইস-এ ১৯০৪ সালে। কোন ইউরোপীয় দেশের ফুটবল দল সেবার সাগর পাড়ি দিয়ে কানাডায় যেতে পারেনি। দুটি আমেরিকার ও একটি কানাডার ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কানাডা স্বর্ণপদক পায়। সবচেয়ে মজার বিষয়, গত ৭৫ বছরে কানাডা আর কখনও ওলিম্পিক ফুটবল ফাইনাল পর্যন্ত যেতেই পারেনি।

অবশেষে ১৯০৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে প্রকৃত অর্থে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। এই ওলিম্পিকে ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। ফ্রান্সের ছিল দুটি দল। প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ড প্রথম, ডেনমার্ক দ্বিতীয় ও হল্যাণ্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ফুটবলই ওলিম্পিকের প্রধান আকর্ষণ হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হলে ফুটবলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ওলিম্পিকে ফুটবলের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই বিতর্ক চলছিল। অবশেষে ১৯৭৬ সালে মণ্টিয়্রল ওলিম্পিকের প্রাক্কালে ২১তম ওলিম্পিক সংগঠনী কমিটির সিদ্ধান্তে বিতর্কের অবসান হয়েছে। এখন বলা যায় কার্যত ওলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার আসন স্থাপিত হয়েছে ১৮৯৬ সালে।

এ পর্যন্ত সমাপ্ত ২১টি ওলিম্পিকে মোট ১১টি দেশ ফুটবলে ওলিম্পিক স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। এর মধ্যে হাঙ্গেরি সবার শীর্ষে। এই দেশ তিনবার স্বর্ণ, একবার রৌপ্য, একবার ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ওই শীর্ষাসনে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থান ফুটবল খেলার আবিষ্কারক ইংল্যাণ্ড—প্রাচীনকালে—১৯০০, ১৯০৮ ও ১৯১২ সালে স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে। দুটি স্বর্ণপদক পায় উরুগুয়ে এবং একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, জি ডি আর, ইতালি, পোল্যাণ্ড, সুইডেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

১৯১২ সালে স্টকহোম ওলিম্পিকে ১২টি দল অংশ নেয়। এই ওলিম্পিকেই 'পরাজিতের বিদায়' এই পদ্ধতি চালু হয়। ফল আগের ওলিম্পিকের ঠিক অনুরূপ। (বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯১৬ সালে কোন ওলিম্পিক হয়নি)। পরবর্তী সপ্তম ওলিম্পিক হয় ১৯২০ সালে আণ্টোয়াপে। ১৪টি ইউরোপীয় দল ছাড়া মিশরের একটি দল এই ওলিম্পিকে অংশ নেয়। এখানে 'পরাজিতের বিদায়' পদ্ধতির একটু সংশোধন করে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। খেলার ফল ঃ বেলজিয়াম—স্বর্ণ, স্পেন—রৌপ্য ও হল্যাণ্ড—ব্রোঞ্জ।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সেই ফুটবল-জনক ইংল্যাণ্ডের কি হল। পেশাদারী ফুটবল খেলা ব্রিটেনের বাছাই খেলোয়াড়দের টেনে নিয়ে যায়। ফলে দুর্বলদের নিয়ে গঠিত ইংরেজ দল প্রথম খেলাতেই নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নেয় ওলিম্পিক অঙ্গন থেকে।

১৯২৪ সালে প্যারিস ওলিম্পিক ফুটবল ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইবার দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ের দল অংশ নেয় এবং ফুটবল বিশ্ব মঞ্চে ইউরোপীয় পদ্ধতির পাল্টা আমেরিকান পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের তাক লাগিয়ে দেয়। মোট ২২টি দল অংশ নেয়। উরুগুয়ে শক্তিশালী যুগোশ্লাভিয়াকে ৭—০, ফ্রান্সকে ৫—১ এবং ফাইনালে সুইজারল্যাণ্ডকে ৩—১ গোলে হারিয়ে দেয়। এই দলের আন্দ্রেদে, নাসাজি ও স্ক্যারোন ফুটবল ইতিহাসে স্থান করে নেয়।



মণ্টিয়্রল ওলিম্পিক '৭৬। ফুটবল ফাইনালে পূর্ব জার্মানি (৩) ঃ পোল্যাণ্ড (১) কালো জার্সি / অমিয় তরফদার



মণ্ট্রিয়েল ওলিম্পিক '৭৬। ফুটবল ফাইনালে পূর্ব জার্মানি : পোল্যাণ্ড / অমিয় তরফদার

পরবর্তী আমস্টার্ডাম ওলিম্পিক ও ১৯৩০ সালে বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপেও উরুগুয়ের ওই দল প্রথম স্থান অধিকার করে। এই ওলিম্পিকে আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, চিলি ও যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিলে ফুটবলে দুই ধারা প্রাধান্য লাভ করে।

১৯৩২ সালে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ১০ম ওলিম্পিকে ইউরোপের অ্যামেচার দলগুলি অর্থাভাবে যোগ দিতে পারেনি বলে উদ্যোক্তারা ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেন। এই সময়ে পেশাদার ও অপেশাদার ফুটবলে এক বিরোধ দেখা দেয়। পেশাদার সংস্থাগুলি ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের 'লোক' বাছাই করেন আর যেসব দেশে পেশাদারী খেলা নেই তারা নিজ নিজ খেলোয়াড়দের মানোন্নত করার সুযোগ দেন।

১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে যুদ্ধের জন্য ওলিম্পিক হয়নি।

পরবর্তী ওলিম্পিকগুলিতেও ফুটবলের মর্যাদা ছিল দ্বিতীয় (ফিফা-১ম)। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে সুইডিস টিম প্রথম হয়, দ্বিতীয় যুগোশ্লাভিয়া। কিন্তু ওই পুরো সুইডিস দলকে ইতালির একটি ক্লাব কিনে নিলে সুইডেন বিপদে পড়ে যায়।

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম অংশগ্রহণ করে। এই দলের ভাল খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ফাইনালে যায় যুগোশ্লাভিয়া (প্রথম) ও হাঙ্গেরী (দ্বিতীয়)। ১৯৫৬-র ওলিম্পিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সোনা এবং যুগোশ্লাভিয়া রৌপ্য পায়।

১৯৬০ রোম ওলিম্পিকে ৫২টি দেশ অংশগ্রহণ করার আবেদন জানায়। বিশ্ব অ্যামেচার ফুটবল কমিটি প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে খেলার ব্যবস্থা করে ১৬টি দেশকে চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণের জন্য। আগের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন আঞ্চলিক খেলায় বুলগেরিয়ার কাছে হেরে যাওয়ায় ওলিম্পিকে যেতে পারেনি। এই সময়েই সিদ্ধান্ত হয়, যে খেলোয়াড় বিশ্বকাপে অংশ নেবে তারা ওলিম্পিকে খেলতে পারবে না। সে দেশে পেশাদারী খেলা না থাকলেও। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ওই ব্যবস্থা চলে। ওই বছর ফিফা ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। আবার ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিফা ওই সিদ্ধান্ত বদল করে (সে সম্পর্ক আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। যুগোশ্লাভিয়া ও ডেনমার্কের মধ্যে ফাইনাল হয়। ফল—প্রথম ডেনমার্ক, দ্বিতীয় যুগোশ্লাভিয়া, তৃতীয় হাঙ্গেরী, চতুর্থ ইতালি।

১৯৬৪ সালে টোকিয়ো ওলিম্পিকে ৬৪টি দেশ প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ফাইনালে হাঙ্গেরি চেকোশ্লাভাকিয়াকে হারায়। হাঙ্গেরি তৃতীয়বারের জন্য স্বর্ণপদক অর্জন করে।

১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে হাঙ্গেরিকে হারিয়ে পোল্যাণ্ড জয়ী হয়। ১৯৭৬ সালে মণ্ট্রিয়লে পূর্ব জার্মানি প্রথম, পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় হয়।

২২তম ওলিম্পিকে ফুটবলের সময় সূচী

	সময়	স্থান	খেলার নম্বর
২০ জুলাই	রাত ৭টা	মস্কো	১
	" ৬টা	লেনিনগ্রাদ	২
	" ৬টা	কিয়েভ	৩
	" ৬টা	মিনস্ক	৪
২১ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	৫
	" ৭টা	লেনিনগ্রাদ	৬
	" ৭টা	কিয়েভ	৭
	" ৭টা	মিনস্ক	৮
২২ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	৯
	" ৭টা	লেনিনগ্রাদ	১০
	" ৭টা	কিয়েভ	১১
	" ৭টা	মিনস্ক	১২
২৩ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	১৩
	" ৭টা	লেনিনগ্রাদ	১৪
	" ৭টা	কিয়েভ	১৫
	" ৭টা	মিনস্ক	১৬
২৪ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	১৭
	" ৭টা	লেনিনগ্রাদ	১৮
	,, ৭টা	কিয়েভ	১৯
	" ৭টা	মিনস্ক	২০
২৫ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	২১
	" ৭টা	লেনিনগ্রাদ	২২
	" ৭টা	কিয়েভ	২৩
	" ৭টা	মিনস্ক	২৪
২৬ জুলাই	কোন খেলা হবে না।		
২৭ জুলাই	কোয়ার্টার ফাইনাল		
	সন্ধ্যা ৬টা	মস্কো	২৫
	,, ৬টা	লেনিনগ্রাদ	২৬
	,, ৬টা	কিয়েভ	২৭
	,, ৬টা	মিনস্ক	২৮
২৮ ও ২৯ জুলাই কোন খেলা নেই।			
৩০ জুলাই	রাত ৮টা	মস্কো	২৯
সেমিফাইনাল	" ৭টা	কিয়েভ বা মস্কো	৩০
৩১ জুলাই কোন খেলা নেই।			
১ আগস্ট	রাত ৮টা	মস্কো	৩১
(৩য় ও ৪র্থ স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা)			
২ আগস্ট	রাত ৮টা	মস্কো	৩২
	(ফাইনাল)		

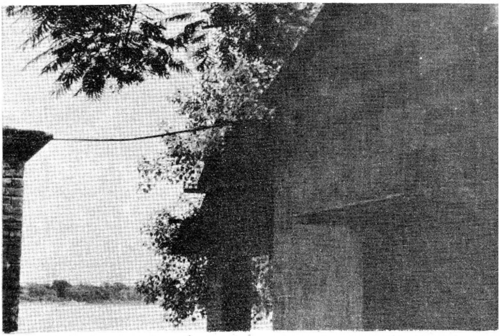
ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা ঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় রেখা ঃ জি সান্তা **১৯**



গঙ্গাই চাতরা সুইমিং ক্লাবের একমাত্র ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওদের পাঁজিপুঁথি দেখে জলে নামতে হয়। না হলে কে জানে কখন বানের জলে ছেলেমেয়েগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। শ্রীরামপুরের চাতরা সুইমিং ক্লাবের কথা বলছিলাম। সাঁতার শেখার জন্য ওদের পুকুর নেই। গঙ্গাই ভরসা। ক্লাব সম্পাদক কানাইলাল চ্যাটার্জি অবশ্য বললেন : বানের জন্য ভয় নেই। কবে কখন বান আসবে তা ছেলেমেয়েরা সবাই জানে। তবে তিনি অস্বীকার করতেও পারলেন না যে গঙ্গায় ছেলেমেয়েদের সাঁতার কাটা বিপজ্জনক ব্যাপার। তাই প্রতিদিন সাঁতারের সময় অন্তত দশজন পাকা সাঁতারুকে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়। এক একজনের ওপর ভার থাকে চার-পাঁচ জনকে লক্ষ্য রাখার। তাছাড়া পাড়ে বসে বয়স্ক লোকেরা কড়া নজর রাখেন কোথাও কোন অঘটন না ঘটে। গত পঁচিশ বছর ধরেই ওই সাঁতার ক্লাব চলছে, কোন অঘটন ঘটেনি।



একেবারে গঙ্গার ওপরেই চাতরা সুইমিং ক্লাব



বুলা চৌধুরী

আর ওই গঙ্গায় সাঁতার শিখেই গোষ্ঠ দাস, পরমেশদাস ঘোষ, তপন দে, নারায়ণ পাল, সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ সাঁতারু দূরপাল্লার সাঁতারে অনেক সাফল্য দেখিয়েছেন। পরমেশদাস ঘোষ মুর্শিদাবাদের দূরপাল্লার সাঁতারে একসময় একাধিপত্য করেন। প্রভাত ভট্টাচার্য, দুলাল কুণ্ডু, রঞ্জিত ব্যানার্জিও সাফল্য কম দেখাননি। তাদের শিক্ষাও এখানেই। এছাড়া ঝুলন পাল, কমল চিনা প্রমুখ প্রবীণ সাঁতারুরাও ছিলেন এই ক্লাবেই।

নবীন সাঁতারুদের মধ্যে এই ক্লাবের ইলা পালের নাম সবাই জানে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা থেকে অসংখ্য সোনা রুপো জিতে এনেছে। সেই ইলাও এই ক্লাবেরই। ওর যখন এগারো বছর বয়স, তখন থেকেই ওর সাফল্যের শুরু। জাতীয় সাঁতারে একশো ও দুশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গত পাঁচ বছরে একবার ছাড়া ইলা কারো কাছে হারেনি। মাদ্রাজে ভারত-সিংহল সাঁতারে ইলাই ছিল একমাত্র ভারতীয় মেয়ে যে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে একটি সোনার পদক লাভ করে। এছাড়া বুলা চৌধুরী গত তিন বছর ধরে বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাচ্ছে। বুলারা থাকে হিন্দ মোটরে। সেখান থেকে ওর মা প্রতিদিন মেয়েকে নিয়ে আসে চাতরায় সাঁতার শেখাতে। মানস বসু নামে একটি ছেলে গত বছর থেকে সাঁতার শিখছে, এখনই রাজ্য ও জাতীয় সাঁতারে বেশ কয়েকটি পদক দখল করেছে।

এদের সুবিধা অসুবিধার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম ওদের ট্রেনার পশুপতি কুণ্ডুর সঙ্গে। স্বভাবতই সুবিধার ঘরে শূন্য, অসুবিধাই হাজার রকম। বর্ষাকালে গঙ্গায় জল বাড়ার জন্য সাঁতার বন্ধ রাখার অসুবিধা, গঙ্গার জল হাল্কা বলে অন্য ধরা জলে সাঁতারের সময় ঠিক রাখার ঝামেলা। সর্বোপরি গঙ্গার ঘোলা জলে কার কি ভুল হচ্ছে তা বোঝা দুষ্কর। পশুপতিবাবু দুঃখ করেই বললেন : আমরা সুইমিং পুল চাই না। একটা শুধু দু'পাড় বাঁধানো পুকুর চাই। যেখানে ছেলে-মেয়েগুলোর ভুল ভ্রান্তি একটু দেখে শুধরে দিয়ে ট্রেনিং দেওয়া যায়। মাঝে মাঝেই আমরা ইলা, বুলা, মানসদের কাছাকাছি কোন পুকুরে নিয়ে গিয়ে একটু আধটু দেখাবার চেষ্টা করি, কিন্তু স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না হলে তা সম্ভব নয়। উনিই বললেন : শ্রীরামপুর আদালতের আঙ্গিনায় সরকারের নিজস্ব একটা পুকুর আছে, সেটার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। দেখা যাক কি হয়। প্র্যাকটিসের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা ও একটা নভিশ বেড করতে পারলে তবেই সার্থক হবো। তখন আর আমাদের এই দেড়শো ছেলেমেয়েকে গঙ্গা-ভরসা করতে হবে না।

বলতে গেলে একেবারে গঙ্গার ওপরেই ক্লাব ঘর। ক্লাব ঘরে দেখলাম হাল্কা ঘরে ব্যায়াম করার কিছু সরঞ্জাম। আর কোন খেলাধূলার ব্যবস্থা করেন কিনা জানতে চাইলে ক্লাব সম্পাদক কানাইবাবু সরাসরি বললেন : দেখুন, আমরা সাঁতার নিয়েই আছি। এটাই আমাদের গর্ব। এ অঞ্চলে সাঁতার নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচণ্ড উৎসাহও আছে। তবে আমরা সাঁতারু-দের প্রয়োজন বলে ওদের বাস্কেটবল খেলার ব্যবস্থা করি। কিন্তু আমাদের মাঠ তো নেই, তাই পাশে স্কুল মাঠে ওরা খেলে। চাতরা সুই-মিং ক্লাব প্রতি বছর গঙ্গাবক্ষে চার মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এককালের সাঁতারু কানাইবাবু তাই আবার বললেন : সাঁতার নিয়ে আছি, এটা নিয়েই থাকতে চাই। পুকুরে সাঁতার কাটার একটু ভাল সুযোগ পেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে অনেক ভাল ফল দেখাবে তা আমরা হলফ করেই বলতে পারি।



ইলা পাল

ফুটবল মানেই কি গণ্ডগোল—ঢাকা মাঠে মনে হয় তাই

ঢাকা থেকে আবদুল তৌহীদঃ 'ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বলছি' বলে এখন আর খেলার খবর দেওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। খেলা হচ্ছে না তা নয়, খেলা শুরু হয় ঠিকই, কিন্তু খেলা শেষ বুঝি আর হয় না। খেলা শেষের বাঁশি যখন বাজে তখন আশি মিনিটের খেলার হয় না শেষ। কোন একটা কারণে খেলাগুলোর হয় অপমৃত্যু। আর এ সমস্ত ঘটনা ঘটে এখানকার লিগের বড় বা নামী দলগুলো যখন ফলাফলে হারতে থাকে বা ড্র করে পয়েন্ট খোয়াতে থাকে, ঠিক তেমনি সময়ে। মাঠে তখন খেলার খবরের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় কেমন করে খেলা পণ্ড হলো তার কারণ খোঁজা। ঢাকা স্টেডিয়ামে এটা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়েই বোধহয় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

খেলায়, বিশেষ করে ফুটবল মাঠে গণ্ডগোল খুব একটা নতুন কিছু নয়, অস্বাভাবিকও নয়, কিন্তু সমর্থক নামক এক ধরনের দর্শকের উশৃঙ্খলতা খেলার খবরকে ছাপিয়ে দেয়। তাদের নির্লজ্জ ইঁট ছোড়া-ছুড়ি ফুটবলের সৌন্দর্যকে শুধু গলা টিপে হত্যাই করে না অপর নিরীহ দর্শকদের নিরাপত্তাকেও বিপন্ন করে তোলে। তাদের খেয়ালী আচরণের খেসারত দিতে অনেককেই আহত হয়ে হাসপাতাল-ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়।

যারা ক্লাব চালান তাদের সীমিত সামর্থের অবস্থাটাও সকলের নজরে পড়ে। দোর্দণ্ড প্রতাপ ক্ষিপ্ত জনতাকে সামাল দেওয়ার কম্মো তাদের নয়—শান্তি-রক্ষী বাহিনীও হিমসিম খায় তাদের শান্ত করতে। এই উশৃঙ্খল ব্যক্তিরা শুধু খেলা পণ্ড করা বা স্টেডিয়ামের সম্পত্তি নষ্ট করেই শান্ত হয় না, তারা দল বেঁধে মিছিল করে শহরের বিভিন্ন নিয়ন সাইন বোর্ড ভাঙতেও পিছপা হয় না। পিছপা হয় না বিভিন্ন ব্যক্তির, পুলিশের, দমকল বাহিনীর গাড়ি পোড়াতেও। অতএব চারিত্রিক বিচারে এরা কোন অবস্থাতেই ফুটবল-প্রিয় হতে পারে না।

এমনই এক উশৃঙ্খলতার শিকার হয়ে গত বছরের ২০ জুলাই মারা গিয়েছিল কিশোর ফারুক। সেদিনের খেলা ছিল মোহামেডানের সঙ্গে আবাহনীর। সেই নির্মম বেদনার ক্ষত আমাদের এই শ্রেণীর দর্শকদের মনে কোন রেখাপাত করেছে বলে মনে হয়না। এমনি দুর্ঘটনায় ফারুক মারা যাওয়ার পর বেশ কিছু দর্শক স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৃত ফারুকের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য দেনদরবার করতে এগিয়ে এসেছিল সমিতি গড়ে। সবাই আশা করেছিল দর্শকদের এই সচেতনতা দিয়ে উশৃঙ্খলতাকে দমন করা যাবে। কিন্তু যাদের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির প্রভাব বেশী তাদের কাছে নীতিকথা আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়, তাই-ই প্রমাণ করছে আজকের ঢাকা স্টেডিয়ামের ওই শ্রেণীর দর্শকদের আচরণ। এদের আচরণে ফুটবল-প্রিয়, সহনশীল দর্শকরা মাঠে আসাই একরকম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কি হবে খেলা দেখতে গিয়ে জান খুইয়ে।

এ বছর খেলার মাঠে প্রথম গণ্ডগোল হয় ১৩ জুলাই। খেলা চলছিল আবাহনী আর ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের মধ্যে। খেলা শেষ হওয়ার দু'মিনিট আগে আবাহনীর বিরুদ্ধে পেনাল্টির জায়গায় রেফারি নির্দেশ দিলেন কর্নারের। ওয়াণ্ডারার্স দাবী তুললো পেনাল্টির। শুরু হলো বচসা। রেফারি ১২ মিনিট অপেক্ষা করে শেষ বাঁশি বাজালেন। খেলা হলো ভণ্ডুল। পরে অবশ্য এ খেলার পুরো পয়েন্ট আবাহনীকে দেওয়া হয়েছে। আর বেয়াদপির জন্য ওয়াণ্ডারার্স-এর দুজন খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

পরের দিন, ১৪ জুলাই খেলা হচ্ছিল মোহামেডান আর বি জে আই সি-র মধ্যে। সে খেলাতেও গোলযোগ দেখা দিল রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে। খেলা শেষ হলেও দর্শকরা যা খুশী তাই করতে চেয়েছিল, আর তাই পুলিশকে ৩ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছাড়তে হয়েছিল। এ খেলা অবশ্য পরিত্যক্ত হয়নি, তবে খেলা শেষে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যাতে অনেকের জীবনের নিরাপত্তা হয়েছিল বিপন্ন।

এর পর যে খেলা পণ্ড হলো সেটা ছিল ওয়াণ্ডারার্স আর মোহামেডানের মধ্যে ২৪ জুলাই। সেদিনের ঘটনা আগের সব তাণ্ডবতাকে ম্লান করে দিয়েছিল। সেদিনও দ্বিতীয়ার্ধের ২৬ মিনিট খেলা চলার সময় ওয়াণ্ডারার্স-এর অনুকূলে রেফারি একটা ফ্রি-কিক দিলে গণ্ডগোল শুরু হয়। ওয়াণ্ডারার্স জিতছিল ২-১ গোলে। প্রতিপক্ষের খুশী না হওয়ারই কথা। খেলাটা ছিল রাতে—শেষ হওয়ার কথা সাড়ে আটটায়। গণ্ডগোল ঠাণ্ডা হতে রাত হলো ১১টা। গণ্ডগোল আয়ত্বে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস পেরিয়ে এবারে ফাঁকা গুলির আওয়াজও করতে হলো কয়েক রাউণ্ড। আহত হলো শতাধিক দর্শক। স্টেডিয়ামের ক্ষয়ক্ষতি করেই দুবৃত্তরা শান্ত হলো না, শহরের বিভিন্ন নিয়ন সাইন, সাইন বোর্ড ভাঙচুর করলো, মোহামেডান ক্লাবে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলো, ওয়াণ্ডারার্স ক্লাব আক্রমণ করলো, জনৈক কর্মকর্তার গাড়ি পোড়ালো—পুলিস এবং ওয়াণ্ডারার্স সমর্থকদের পাল্টা হুমকিতে কাজ হয়েছিল।

আবার গণ্ডগোল হল ২৭ জুলাই। সেদিন যে কেন স্টেডিয়ামে মারামারি শুরু হল প্রথমে তা বোঝা গেল না। শুধু দেখা গেল হঠাৎ এক-দল লোক লাঠি-সোটা নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকে দর্শকদের পেটাতে শুরু করল। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঘটনা ঘটেছে আউটার স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় বিভাগের এক খেলা নিয়ে। খেলা হচ্ছিল বি ডি আর এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মধ্যে। একটি পেনাল্টির দাবী নিয়ে দর্শকরা খেলা পণ্ড করতে মেতেছেন। আউটার স্টেডিয়ামের খেলা পণ্ড করেও তারা শান্ত হয়নি। চেয়েছিল লাঠি-সোটা দিয়ে ভেতরের স্টেডিয়ামের খেলা ভাঙতে। কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত খেলা পণ্ড করতে।

তারপরও থেমে নেই এই শ্রেণীর দর্শকদের মত্ততা, ক্ষিপ্ততা। ১০ আগস্ট স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছিল মোহামেডানের সঙ্গে ওয়ারির। ওয়ারি দল যেই দু-দুটো গোল দিয়ে ফেলেছে অমনি শুরু হলো ইঁট বৃষ্টি। যেমন করেই হোক খেলা বন্ধ করতে হবে। হারা চলবে না। এদিকে খেলার মাঠটা স্টেডিয়ামের মাঝ বরাবর হওয়ায় ইঁটের আওতার একটু বাইরে গেছে খেলা। ইঁটের তোড়ে তাই অত সহজে আর খেলা পণ্ড হচ্ছে না। শান্তিরক্ষী বাহিনীও সেদিন বেশ তৎপরতার সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে ঢুকে পড়ায় খেলা চলেছে। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার পাঁচ মিনিট আগে একটা বল ইচ্ছে করেই মারা হল দর্শকদের কাছে। আর যেহেতু সে বলটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি, তাই খেলা আর চালু করা যায়নি। পুলিশ বল আনতে গেলে এলোপাথারী ইঁট পড়েছে তাদের ওপর। অন্য সময় সাধারণত খেলোয়াড়রাই কেউ বলটা চেয়ে আনে—সেদিন কিন্তু তাও হয়নি। বলটা গ্যালারিতে থেকে গেছে।

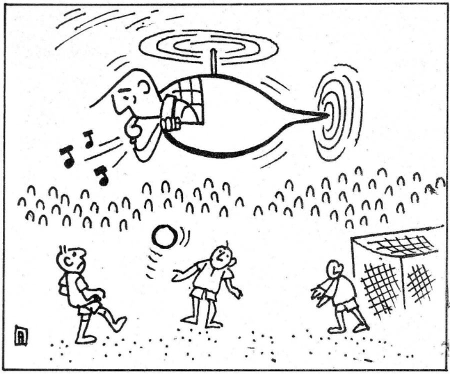
রেফারি অপর বল দিয়ে খেলা চালু করতে চাইলে পিছিয়ে থাকা মোহামেডান দলের খেলোয়াড়রা নতুন বলে খেলতে রাজী হয়নি। রেফারির কথায় তারা কান দেয়নি—বলও আনা যায়নি। রেফারি বারো মিনিট অপেক্ষা করে খেলার শেষ বাঁশি বাজিয়ে ফিরে এসেছেন মাঠ থেকে। খেলা হয়েছে পরিত্যক্ত, ভণ্ডুল। এই হোল এক নজরে ঢাকার মাঠে খেলার খবর, গণ্ডগোলের খবর।

এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের

প্রশ্ন সমর্থকদের কাছে, ফুটবল কর্মকর্তাদের কাছে —আপনাদের এসব বিষয়ে অর্থাৎ খেলা বানচাল করার ব্যাপারে কি বলার আছে বলেই ফেলুন না। প্রশ্ন হচ্ছে, এমনভাবে খেলা পরিত্যক্ত হবার জন্য দায়ী কে? রেফারি, না কর্মকর্তা? বড় বড় দলগুলোকেও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মাঠে মারামারি করা, রেফারির সঙ্গে তর্ক করা বা তাদের পেটানোর বিরুদ্ধে আপনারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? মাঠের পাশে প্রত্যেক দিনই ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্যরা বসে খেলা দেখেন। তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন আসে—কেননা এযাবত্ত রেফারির সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর সেসব খেলোয়াড়রা সবাই-ই ছোট ছোট দলের —বড় দলের ব্যাপারে তাদের এমন পক্ষপাত-পুষ্ট নীরবতা কেন?

যাই হোক আমাদের কথা হোল নিরীহ ফুটবল-প্রেমীদের নিয়ে। তারা দলের সমর্থক হয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে মাঠে যান না—তারা মাঠে ভিড় জমান নেহাতই ফুটবলের প্রেমে। তাদের এ হেনস্তা কেন? আদপে খেলা চালাতে হলে পথ একটাই—তা হোল নিরপেক্ষতা। দলমতের ঊর্ধে থেকে ফুটবল-প্রেম নিয়ে ফুটবলের ব্যবস্থা করুন। দলের সমর্থন করতে গিয়ে যারা ফুটবলের মৃত্যু কামনা করেন, মৃত্যু ঘটাচ্ছেন, তাদের ব্যবস্থাপনা থেকে সরিয়ে দিন। ফুটবলের জন্য, ফুটবলের স্বার্থে দলের স্বার্থকে অনুগ্রহ করে দূরে সরিয়ে রাখুন। দেখবেন ফুটবল আপন প্রভাবে ভাস্বর হয়ে নির্মল আনন্দে সকলকে ভরিয়ে দেবে। আমাদের ঐতিহ্যও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

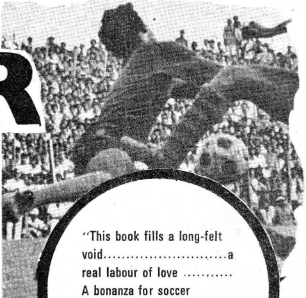
১০.৮.৭৯



কার্টুন : ত্রাণি

ভারতে এই প্রথম ফুটবলকে জানার অসাধারণ সংকলন

INDIA SOCCER ANNUAL 1979



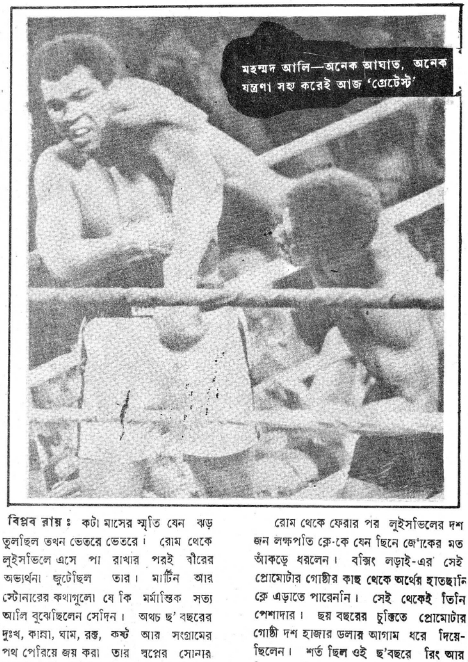
"This book fills a long-felt void............................a real labour of love .... A bonanza for soccer enthusiasts.

Hindu
9 June, 1979.

সারা ভারতের সেরা লেখকদের রচনা।
পাতায় পাতায় ছবি।
রঙীন ছবিও ২০টির উপর।
দাম —৬ টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী। কলকাতা-৭২। ফোন ২৭৩৩১৬/২১২১৬৬

আলি অবসর নিলেন (২)



মহম্মদ আলি—অনেক আঘাত, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেই আজ 'গ্রেটেস্ট'

বিপ্লব রায় ঃ কটা মাসের স্মৃতি যেন ঝড় তুলছিল তখন ভেতরে ভেতরে। রোম থেকে লুইসভিলে এসে পা রাখার পরই বীরের অভ্যর্থনা জুটেছিল তার। মার্টিন আর স্টোনারের কথাগুলো যে কি মর্মান্তিক সত্য আলি বুঝেছিলেন সেদিন। অথচ ছ' বছরের দুঃখ, কান্না, ঘাম, রক্ত, কষ্ট আর সংগ্রামের পথ পেরিয়ে জয় করা তার স্বপ্নের সোনার পদকটা যেদিন আলি ফেলে দিলেন জলে ......'না, কোন কষ্ট নেই আজ, দুঃখও নেই। আজ আমি মুক্ত। ওঃ, কি স্বস্তি।'

ওই সোনার পদকটাই কি বাঁধনে না বেঁধে রেখেছিল মানুষটাকে। টাইমসের কথাগুলোই তো যথেষ্ট। 'ক্যাসিয়াস কখনো পদকটা হাতছাড়া করে না। ওটাকে নিয়েই ও খায়, রাতে ঘুমোয়।' ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশ ফেরার সময় পদকের ধারালো কোণে কতবার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে পিঠ। এক সময় গায়ে লাগানো সোনাটুকুও উঠে গিয়েছিল পদকটা থেকে। তবু তা খুলে ফেলার কথা ভাবতে পারেননি তিনি।'

রোম থেকে ফেরার পর লুইসভিলের দশ জন লক্ষপতি ক্লে-কে যেন ছিনে জেঁাকের মত আঁকড়ে ধরলেন। বক্সিং লড়াই-এর সেই প্রোমোটার গোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থের হাতছানি ক্লে এড়াতে পারেননি। সেই থেকেই তিনি পেশাদার। ছয় বছরের চুক্তিতে প্রোমোটার গোষ্ঠী দশ হাজার ডলার আগাম ধরে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল ওই ছ'বছরে রিং আর রিং-এর বাইরে ক্লে-র সমস্ত আয়ের অর্ধেক তাকে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক অনেক পরে ক্লে বুঝেছিলেন তাকে ব্যবহার করে কি পরিমাণ অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন সেই ব্যবসায়ীর দল।

সাদা চামড়ার লোকেদের প্রতি বিদ্বেষ তার ছিলই। এবার তা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগল। প্রোমোটার গোষ্ঠী ক্লে-কে ধর্ম ত্যাগ করতে আদেশ দিয়ে বসলেন একদিন। ক্লে সোচ্চার প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন। সনি লিস্টনের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াই বাতিল হবার পরই তিনি বিদ্রোহ করেন। 'অকৃতজ্ঞ, ছোটলোক, অবাধ্য ব্যাস্টার্ড একটা'—এতসব বিশেষণ তাকে উপহার দিয়ে সেই প্রোমোটার গোষ্ঠী লুইসভিলের মানুষদের সাবধান করে দিয়েছিলেন 'ও সাদা চামড়ার লোকদের ঘৃণা করে, ওকে চিনে রাখ।'

সে এমন একটা সময় যখন লুইসভিলের অধিকাংশ দোকানপাট, রেস্তোরাঁ কি সিনেমায় কালোদের ঢোকার অধিকার ছিল না। একটা রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকে টেবিলে বসার পর ওয়েট্রেস তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, এখানে নয় অন্য জায়গায় যান। ক্লে বুঝিয়ে ছিলেন, আমি ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। তবু তাকে সার্ভ করা হয়নি। রেস্তোর'ার মালিকের সামনে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্লে। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন মোচড় দিয়ে যাচ্ছিল তার মাথা আর স্টমাকে। 'ওলিম্পিকের সুখস্বপ্ন শেষ। নিজের দীন হীন ঘরে ফিরে এসেছি আমি আবার।'

সম্বিৎ ফিরে এল যেন তীক্ষ্ণ কর্কশ এক চিৎকারে। 'এই ওলিম্পিক নিগার, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস একটা মিল্ককেক-এর আশায় ?' টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন ক্লে তারপর রেস্তোর'া ছেড়ে।

হ্যাঁ, সেই দিন, সেই রাত্রে ওহিওর জলে ক্লে দিয়ে এসেছিলেন পদকটিকে। 'এটাকে আমি পুজো করতাম, এটা আমার কীর্তির সাক্ষী। কিন্তু এই নয়, এর চেয়ে বড় কিছু চাই আমি, বেশী কিছু।'

তিল তিল করে গড়ে ওঠা বিশ্বজয়ের স্বপ্ন যেন ক্যাসিয়াস ক্লে'কে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে সেই সময়টায়—ষাটের দশকের শুরুতে। শিক্ষানবীশ কালে কি প্রথম যৌবনে অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও তিনি বুঝেছিলেন জীবনের লক্ষ্যপথে সঠিকভাবে এগোতে হলে মেয়েদের থেকে তাকে দূরে থাকতেই হবে। নিজে তাই থাকতেনও দূরে। কে যেন. অদৃশ্য বেড়ি পরিয়ে রেখেছিল পায়ে। বারবার পুরনো বক্সারদের মুখগুলো ভেসে উঠত চোখের সামনে। 'ওদের মনে করতে দাও তুমি একটা মড়া'। 'ওদের থেকে দূরে থাকো, নইলে তুমি শেষ হয়ে যাবে।'

ক্যাসিয়াস ক্লে'র জীবনদর্শন পরিণত রূপ পেয়েছে এই পথেই। সেই সময়কারই একটা ঘটনা তাকে নাড়া দিয়েছিল ভয়ঙ্করভাবে। অপেশাদার থাকাকালে তার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু ছিল ডনি হল। ডনির ধারণা ছিল মেয়েদের কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানা নেই বলেই ক্লে'র এই অকারণ নারী-ভীতি। ডনিই একদিন ক্লে'কে টেনে নিয়ে যান এক বারবনিতার ঘরে।

দু'ঘণ্টা পর দু'জনে যখন বেরিয়ে এলেন সেই নিষিদ্ধ পল্লী ছেড়ে ক্লে যেমনটি ছিলেন তেমনই রয়ে গেছেন। অনেক অনেক দিন

পর ক্লে এই ঘটনা নিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'কে যেন মাটির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আটকে দিয়েছিল আমায়। আমি নড়তেও পারিনি।'

প্রোমোটার গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ক্যাসিয়াস ক্লে'র প্রথম পেশাদারী লড়াই ১৯৬০-এর ২৯ অক্টোবর লুইসভিলে। ক্লে'র বাগাড়ম্বর কথার ফুলঝুরি ছড়ানোরও সেই শুরু। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পুলিস চিফ টানি হানসকার ছিলেন ক্লে'র সেদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'ও তো একটা ট্যাঙ্ক, ওকে সহজেই ফুটো করে দোব।' এবং দিয়েছিলেনও ৬ রাউণ্ডে জিতে গিয়ে।

তারপর, শুধু জয় আর জয়। অপেশাদার থাকাকালে ১০৬টি লড়াইয়ের ৯৮টিতেই জিতে গিয়েছিলেন তিনি। পেশাদারী জীবনও তার সেই পথে এগিয়েছে। ১৯৬৪-র ২৫ ফেব্রুয়ারি মিয়ামী বীচে সনি লিস্টনকে হারিয়ে ক্লে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেটি ছিল তার ২০তম পেশাদারী লড়াই। আগের উনিশটি লড়াইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হয়েছিল বোধহয় হেনরী কুপারের সঙ্গে লড়াইটা—লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ১৯৬৩-র ১৮ জুন। চতুর্থ রাউণ্ডেই কুপার বেধড়ক মার খেয়ে ক্যানভাসের ওপর লটকে পড়েছিলেন। তবে উঠে দাঁড়ালেও পঞ্চম রাউণ্ডের ১ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডেই ক্লে'র ডান ও বাঁ হাতের শতখানেক ঘুঁষি তাকে নাকাল করে দেয়। বাঁদিকের কেটে যাওয়া ভ্রূ থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। দর্শকদের আর্তনাদ, চিৎকার আর হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল একটাই শব্দ 'মার্ডারার, মার্ডারার'।

তারপর, সব ঘটনাই তো পুরনো হয়ে গেছে এতদিনে। সাতষট্টিতে মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তার খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আইনের সাহায্য নিয়ে খেতাব ফিরে পান তিনি তিন বছর পর। লিস্টনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার পরই তিনি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন 'ব্ল্যাক মুসলিম'-এ যোগদানের কথা। নাম পাল্টে সেইদিন থেকেই তিনি মহম্মদ আলি।

১৯৭৮-এর ১৫ সেপ্টেম্বর লিয়ন স্পিংকসের সঙ্গে জীবনের শেষ পেশাদারী লড়াইটি ধরে ৫৯টি পেশাদারী লড়াই-এ আলির হার মাত্র তিনটিতে। তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একক ও অনন্য নজীরও গড়ে উঠেছে একই সঙ্গে।

এই তো কিছুদিন আগেই বিশ্ব বক্সিং কাউন্সিল জো লুই'কে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য সেঞ্চুরি' ঘোষণা করে দিয়েছে। গুঞ্জন উঠেছিল তারপরই। 'কেন জো লুই? কেন মহম্মদ আলি নয়?' বিতর্কিত ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবু যদি কোনোদিন বিশ্ব বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন জো লুই-এর পাশে আলিকেও বসিয়ে দেয় আর যাই থাকুক বিস্ময় বা আশ্চর্য শব্দ দুটোর স্থান হবে না সেই ব্যাপারটির ধারে কাছে।

হেভিওয়েট বক্সিং-এর ঘোলাটে দৃশ্যপটকে যেভাবে এতকাল ধরে আলোকিত করে রেখেছিলেন মহম্মদ আলি আর কে পেরেছেন তেমন করে আলো করতে? আলির পূর্বসূরীদের কীর্তি-কৃতিত্বকে খাটো না করেও এটা বলায় বাধা নেই পেশাদারী মঞ্চে এসে দাঁড়ানোর পর থেকে এই ১৮-১৯ বছরে আলি যা দিয়েছেন দুনিয়াকে আর কেউ বুঝি তেমনটি দিতে পারেননি। প্রতিদানে শতাব্দীর এই সুপার হিউম্যানের পাওয়াও কিছু কম নয়। দেওয়া-নেওয়ার এই চিরন্তন ধর্মের মাঝে আলি ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন বিরাট আকারে।

তাই, তিনি এক ও অনন্য।



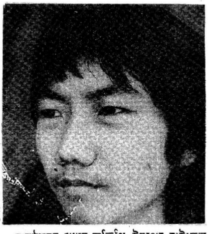
কার্টুন : আলি

২৪ পরগণা টেবল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন রাজীব সিং ও টমাস লি


রাজীব সিং

উত্তর চব্বিশ পরগণার সংবাদদাতা : ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে টেবল টেনিসের ৬ দিন ব্যাপী চতুর্থ জেলা র‍্যাঙ্কিং চ্যাম্পিয়নশিপ জুনিয়র ও সিনিয়র সিঙ্গলসে এবার ৬৮ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে জুনিয়র সিঙ্গলসে ২৪ জন। মহিলা প্রতিযোগীর অভাবে ওই বিভাগের কোন ইভেন্ট চালানো যায়নি।

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে জুনিয়র সিঙ্গলস-এ হাওড়ার বাঁ-হাতি খেলোয়াড় রাজীব সিং তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দেবাশিস সাহাকে যথাক্রমে ২১-১৮, ১৮-২১ ও ২১-২০ গেমে হারিয়ে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে লিগ তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে। অপর খেলায় সিনিয়র সিঙ্গলস-এ ওয়াই এম সি এ-র টমাস লি অপূর্ব দক্ষতায় প্রতিদ্বন্দ্বী অমর রায়কে যথাক্রমে ২১-১৩, ১৫-২১ ও ২১-১৬ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। টমাসের অনবদ্য ফ্লিক শট, স্ম্যাস ও জ্যাব মারগুলি উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করেন।


টমাস লি

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার এন বালকৃষ্ণান পুরস্কারগুলি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন। জেলা ক্রীড়া পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক বিজয় গাঙ্গুলি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিল ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি ক্রীড়া সংস্থা।

ঘুড়ি ওড়ান আজ জাতীয় স্তরের খেলা

সমীর ঘোষ ঃ ঘুড়ির প্রসঙ্গে ওঠে বিশ্বকর্মা পূজার দিনের কথা। আগের দিনের মাঞ্জা দেবার সমস্ত পরিশ্রমের কথা ভুলে সূর্যি মামা চোখ খুলতে না খুলতেই ছাদে ছাদে কিশোর-দের ভীড়। কাঁসর ঘন্টার আওয়াজে পাশ ফিরে এক চোখ মেললেই রক্তিম আভা ছড়ান ঘুড়ির ঝাঁক চোখে পড়বেই। উত্তর ও মধ্য কলকাতা এ ব্যাপারে অগ্রনী হলেও ঘুড়ি প্রায় সব জায়গাতেই কিছু না কিছু ওড়ে। প্রাচীন কাল থেকেই ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল আর আমাদের দেশে। চারশো—সাড়ে চারশো বছর আগেও ঘুড়ি উড়তো। তখনকার সময়ে লক্ষ্মৌ, বেরিলি ও কলকাতার ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ বেশী ছিল।

আজ শুধু বিশ্বকর্মা উপলক্ষ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর স্তর পার হয়ে এসে এটি একটি জাতীয় খেলায় পরিণত। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রথম ঘুড়ির জাতীয় প্রতিযোগিতা দিল্লিতে হয় এবং দিল্লির ইউনিয়ন কাইট ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। এই প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতার কয়েকটি নিয়ম কানুন জানিয়ে রাখা দরকার। ঘুড়ির মাপ হবে, মাঝের কাঁপটি ২৩-১/২ ইঞ্চি ও বাঁকানো কাপটি হবে ২৭ ইঞ্চি। এই ঘুড়িগুলিকে বলা হয় পানতাওয়া। আমরা যেমন দেড়তে, দোতে প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত তেমনি এই ঘুড়িগুলিকে অনায়াসে পানতে বলে চালানো যেতে পারে। দুই প্রতিযোগীর মধ্যে দূরত্ব হবে ৭৫ গজ। একটি রিং-এর মধ্যে প্রতি-যোগীকে থাকতে হবে। চরকি (লাটাই) ধরার জন্য তার রিং-এর মধ্যে কেউ থাকতে পারে। রিং-এর মাপ ২০ ফুট বাই ১০ ফুট।

এবারে আসা যাক প্যাঁচের কথায়। একটি ট্যাঙ্গল (প্যাঁচ) নূন্যতম পক্ষে ৬০০ গজ দূরত্বের বাইরে খেলতে হবে। একটি ট্যাঙ্গল উপর দিয়ে খেলার পর পরেরটি নীচ দিয়ে খেলতে হবে। পাঁচটি ট্যাঙ্গেলের পর প্রতি-যোগীরা রিং পরিবর্তন করতে পারবে। উভয় প্রতিযোগীকে একই সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে হবে। প্রত্যেক দলে তিনজন করে খেলোয়াড় থাকবে। প্রথমে যে নয়টি ট্যাঙ্গল জিতে যাবে সেই বিজয়ী বলে স্বীকৃত হবে। একজন খেলোয়াড় তিনটির বেশী নতুন ঘুড়ি ওড়াতে পারবে না। চূড়ান্ত বাঁশী বাজার আগে কোন খেলোয়াড় যদি রিং স্পর্শ করে বা রিং-এর বাইরে চলে আসে তাহলে একটি ট্যাঙ্গল প্রতি-পক্ষকে দিয়ে দেওয়া হবে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য প্রত্যেক রাজ্য থেকেই একাধিক দল তাদের ক্লাবের নামেই জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

দিল্লির প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় জাতীয় প্রতিযোগিতা জয়পুরে হয়েছিল এবং জয়পুরের ইউনাইটেড কাইট ক্লাব চ্যাম্পি-য়ন হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠান ছিল কলকাতায়। বিজয়ী লক্ষ্ণৌ-এর হিরো কাইট ক্লাব। শেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে মোরাদাবাদে। বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাই-এর যে দলটি বিজয়ী হয়েছিল সেই দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন দিলীপ কাবাডিয়া।

এখন দেখা যেতে পারে এই কয়টি অনুষ্ঠানে বাংলার ভূমিকা কি? জাতীয় প্রতিযোগিতার আবির্ভাব লগ্নেই বাংলা যোগদান করে আসছে। জয়পুরে বৌবাজার কাইট ক্লাব ষষ্ঠ স্থান পায়। কলকাতায় সেন্ট্রাল কাইট ক্লাব রানার্স আপের সম্মান পায়। এর পর বাংলা উল্লেখযোগ্য আর কোন ফল দেখাতে পারেনি :

খোদ কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ অনেক দিনের হলেও ১৯৫৪ সালের পর থেকে পরিমার্জিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর আগে মূলত ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলা চলত। ১৯৫৪ সালে কাইট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হবার পর লিগ ও নক আউট খেলা চালু হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের এই তেইশ বছরের ইতিহাসে এণ্টালি কাইট ক্লাব উল্লেখ-যোগ্য কীর্তি গড়েছে। তারা পরপর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পরপর ছয় বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাক্তন ক্রিকেট আম্পায়ার ও সি এ বি'র প্রাক্তন সেক্রে-টারি শম্ভু পান এই ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন। গত বছর লিগ ও নক আউট কোনটিই সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯৭৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বৌবাজার কাইট ক্লাব ও নক আউট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্যালকাটা নাইন দল। বর্তমান অ্যাসোসিয়েশনে পরিচালনাধীন তিরিশটি ক্লাব আছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, লিগ খেলায় চোদ্দটি ট্যাঙ্গল যারা জিততে পারবে তারাই বিজয়ী হবে। লিগ ম্যাচে রিং-এর ব্যবহার বিশেষ হয় না। এক জন খেলোয়াড় তিনটির বেশী নতুন ঘুড়ি ওড়াতে পারবে না এই নিয়মটিও এখানে প্রযোজ্য নয়। ঘুড়ির জগতে শিরিষ দত্ত, কাসেম আমোলিয়া, জি এ চাটার, দিলীপ মণ্ডল, অজিত মণ্ডল, কাজল নাগ, পঙ্কজ দত্ত, এম ডি হালিম, এম রেহেমান, এম রফিক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঘুড়ির নানান জাত আছে। ভাল জাতের ঘুড়িতে কাগজ, কাঁপ এবং সর্বোপরি প্রস্তুত-কারক উচ্চমানের হওয়া চাই। আগে জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া থেকে কাগজ আমদানি করা হত। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া থেকে কাগজ আমদানি কিছু পরিমাণে হলেও জার্মানি থেকে মোটেই কাগজ আসে না। ফলে ভরসা দেশী কাগজ' এর ফলে ঘুড়ির মান পড়ে যাচ্ছে। আর যেটি বিশেষ প্রয়োজন তা হল ভাল তলতা বাঁশ, কাঁপের জন্য। অবশ্য সবই নির্ভর করে প্রস্তুতকারকের উপর। যেমন ঘুড়ি প্রস্তুতকারক তিনকড়ির নাম আজও ঘুড়ির সমাজে আদর পায়। এখন ঘুড়ি তৈরির ব্যাপারে কলকাতা সবার উপরে। প্রাক্তন ক্রিকেটার কার্তিক বসুর তৈরি 'বোসেজ কাইট' সারা ভারতে বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

এরপর আসছে মাঞ্জার ব্যাপার। এই ব্যাপারে বেরিলি সেরা মাঞ্জা। প্রধানত ভাতের লুদ্দি তার সঙ্গে থাকবে খুব মোটা কাঁচের গুঁড়ো মিহি পাউডার । ভাতকে ময়দার মত করে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। এরপর নানা জন নানা প্রকার মশলা ব্যবহার করে। তদ্ (ডালচিনি জাতীয় জিনিস), তাল মাখান (এক ধরনের গাছের আঠা) সময় সময় বিভিন্ন রঙের ছাঁটের গুঁড়া ও কার্বোরে-গুাম পাউডারও ব্যবহার করা হয়। সবশেষে উল্লেখ করি অভিনেতা দিলীপ কুমার ঘুড়িতে একজন অত্যুৎসাহী, নিজে ঘুড়ি ওড়ান তার নিজস্ব একটি ক্লাবও আছে। একবার তিনিও জাতীয় প্রতিযোগিতার অংশ নিয়েছিলেন।●



দ্বিজুদার আশেপাশে



দিগদর্শক ঃ দ্বিজুদা সেদিন রেফারির হুইসল হাতে গটগট করে যাচ্ছেন, এমন সময় কদলী দলের ৬ জন সমর্থক তাকে বললেন, দাদা দেখবেন—শালা কাঁঠাল দল যেন তিন গোলে কুপোকাত হয়। অর্থাৎ রেজাল্ট চাই থ্রি জিরো, ইন ফেভার অফ কদলি দল। নইলে···। বলে একজন তার কোমর থেকে ধারালো একখানা ছ' ইঞ্চি ছোরা দেখাল। আর গলার কাছে হাত নিয়ে অনেকটা বেহালা বাজানোর ভঙ্গী করল। গলার কাছে হাত নিয়ে বেহালা বাজানোর ভঙ্গীর যে কি অর্থ তা তিনি সঠিক ভাবেই অনুমান করে নিলেন।

আজ তেত্রিশ বছর কলকাতা শহরের হাওয়া নাকে নিয়েছেন তিনি—অতএব বুঝতে একটুও ভুল হল না। তিনি শিউরে উঠলেন, তিনি ঢোক গিললেন, আর তার কেমন যেন সব বিচ্ছিরি লাগতে লাগল। তিনি মৃদু হাসার ভান করে আরও একটু এগিয়ে যেতেই কাঁঠাল দলের জনা দশেক তাকে ঘিরে বলল, শালা কদলী দলকে দফারফা করতে রেজাল্ট চাই দুই এক। অর্থাৎ কাঁঠাল দল দুই, কদলী দল এক, সমঝালেন? দ্বিজুদা বললেন, কী বললেন, অ্যাঁ? তখন একজন তার গেঞ্জির তলায় একটা পিস্তলের মত কি দেখালো। এতে দ্বিজুদা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। একবার মনে মনে ভাবলেন এরা সত্যিকারের কোত্থেকে পাবে? নিশ্চয় ওটা খেলনা পিস্তলই হবে। কিন্তু দশ টন ওজনের প্রচুর ভয় তার মনের মধ্যে ঘটঘট আর গিজগিজ করতে লাগল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, নাঃ রেফারিগিরি করা আর যাবে না এভাবে সব চললে। এ কি কারবার! দ্বিজুদা দুশ্চিন্তিত মুখে মাঠের গেটে এসেছেন এমন সময় প্রায় ছত্রিশজন তাকে ঘিরে ধরে বলল, আজ যদি ফল ড্র না হয় তাহলে তোকে কচু কাটা করব। এই বলে দ্বিজুদার পিঠে প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। দ্বিজুদার কদিন থেকেই পিঠে একটা ব্যাথা হচ্ছে। চার রকম ভিটামিন খেয়ে আর গরম জলের ব্যাগ পিঠে দিয়ে কোনো মতে ব্যাথাটাকে মিইয়ে এনেছেন। আর ঠিক তারই ওপর ওইরকম একটা পেল্লাই থাপ্পড় খেয়ে তিনি উঃ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। একজন ড্র-পন্থী বলল, বুঝলেন, ফলাফল জিরো জিরো হলেই ভাল হয়, নেহাত যদি উল্টো পাল্টা কিছু ঘটে তাহলে এক এক হলেই চলবে। নইলে, বলে তারা একটা বোতল দেখাল। বোতলে টলটল করছে জলের মত কি একটা পদার্থ। দ্বিজুদা ভাবলেন, বাঃ চমৎকার তো এরা! কিন্তু একজন যখন বলল, এটাই তোর মাথায় ঢাললে চামড়া উঠে যাবে, চুল থাকবে না, চোখও থাকবে কিনা সন্দেহ, তখন তিনি বুঝতে পারলেন বোতলের মধ্যে বিষাক্ত কিছু!

দ্বিজুদা যখন গেট পার হয়ে মাঠে ঢুকলেন, তখন তার হাত পা ঠকঠক করে কাঁপছে। তিনি টেন্টের দিকে এগুতেই কাঁঠাল দলের একজন কর্তা-স্থানীয় ব্যক্তি বললেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। বলে দ্বিজুদার কানে কানে বললেন, বুঝলেন দাদা—খেলা হচ্ছে খেলা, লোকেরা খেলতে চায় খেলে, দর্শকেরা দেখতে চায় দেখে। যে ফলই হোক না কেন, যারা খেলে আর যারা দেখে তাদের কিছু এসে যায় না। বুঝলেন কিনা, গীতায় তো লেখাই আছে পড়েছেন নিশ্চয়, আহা কি চমৎকার—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি, অর্থাৎ কিনা কর্মে তব অধিকার, নহে ফলে কভু—না চাহ কর্মের ফল, কর্ম কর তবু। তবে কিনা জানেন তো, ইয়ে বাবু বলছিলেন এবারে বুঝলেন দাদা এই হাজার চারেক দিয়ে একটা টেলিভিশন সেট কিনে রেখেছেন আপনারই জন্য, কেবল কাঁঠাল দল হেরে গেলেই ইয়ে-বাবু খুব খুশী হবেন। বুঝলেন কিনা, হেঁ হেঁ।

দ্বিজুদা অবাক! তিনি বললেন, ইয়ে বাবু তো কাঁঠাল দলেরই একজন হোমড়া চোমড়া ব্যক্তি। উনি নিজের দলের ল্যাজ কাটতে চান? তখন উক্ত ব্যক্তি বললেন, ল্যাজ কাটার কথা কি বলছেন দাদা হেঁ হেঁ, আপনার রসিকতা কি আমার মত সাধারণ লোক বোঝে? ল্যাজ নয়—বুঝলেন, আসলে তার ইচ্ছে হয়েছে তার দল যেন আজ হারে। বুঝলেন না—উদার প্রকৃতির লোক তো—সে তো বুঝতেই পারছেন, আপনার জন্য একটা চমৎকার টেলিভিশন সেট, আহা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওরকম সেট উদার প্রকৃতির লোক ছাড়া কোন্ শালা কিনে দেবে বলুন? তাহলে রাজি তো?

দ্বিজুদা বললেন, হারলে তো হার দিতেই হবে।

লোকটি বলল, আরে হারবে তো বটেই। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে না?

কিন্তু সেটাও শেষ নয়। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কদলী দলের একজন হোমড়া চোমড়া ব্যক্তি বললেন, এই যে দ্বিজুদা, আপনার উপর খুব ভরসা করে একটা কথা কেবল বলব। শালা কদলী দলকে আজ খুব একচোট নিয়ে নিন। দু তিন গোলে হারিয়ে দিন।

দ্বিজুদা অবাক!

কদলী দলের হোমড়া চোমড়া ব্যক্তি বললেন, আপনার জন্য একটা উপহার কিনে রাখা হয়েছে, খুব দামী একটা ডিজিটাল ঘড়ি আর একটা ক্যামেরা, তার সঙ্গে দূরবীণ ফিট করা।

দ্বিজুদা বললেন, এসব কি ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না।

কদলী দলের হোমড়া চোমড়া লোকটি বললেন, বুঝিয়ে বলছি—আমাদের এই খেলা নিয়ে আজ খুব বাজি চলছে। মাড়োয়ারীরা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। তা একজন বাজি রেখেছেন পাঁচ লাখ টাকা। তারা আমাদের দিচ্ছেন আড়াই লাখ—বুঝলেন, যদি আমাদের দল হেরে যায়, তবেই সেটা পাওয়া যাবে। যান এবার মাঠে ঢুকুন। অকুতোভয়ে ঢুকুন। ওকি মশাই, আপনার চোখ দুটো কপালে ঠেলে উঠছে কেন? ও মশাই আপনি পড়ে যাচ্ছেন—কী সর্বনাশ! ওরে দ্বিজুদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, তোরা সব ডাক্তারকে খবর দে—দু বালতি জল নিয়ে আয়।

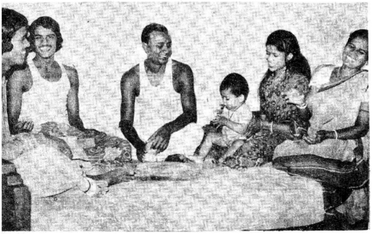




তপন দাস ২৩ বছরের যুবক। বড় দলের খেলোয়াড়। কিন্তু ফুটবল নিয়ে সবসময় ভাবতে ও চায় না। দক্ষিণ শহরতলী ঠাকুরপুকুরে তিন ভাই মা-বাবা মিলে ওদের সংসার, দাদা বিজন, ছোট ভাই অলোক। দুই বোন শিখা ও রেখার বিয়ে হয়ে গেছে, ওরা মাঝে মাঝে এলে বাড়িটা বেশ প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। বাব রবীন্দ্রনাথ দাস ক্যালকাটা ডক লেবারের চাকুরে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেশেন। দুই বড় দলকে নিয়ে বাড়িতে বেশ মজা হয়, বাড়ির সবাই ভালবাসে ইস্টবেঙ্গলকে। মা বলেন, তার ভালবাসার দল হচ্ছে তপন যখন যে দলে খেলবে সেই দল।

তপনের দিনের শুরু, মা এসে ঘুম ভাঙ্গালে। আড্ডা ওর খুব ভাল লাগে না। নজরুল গীতি ও মান্না দে'র গাওয়া যে কোন গান শুনতে ভালবাসে। বাড়ির পরিবেশ ওর কাছে বড় প্রিয়। বেশীরভাগ সময় ও কাটিয়ে দেয় বাড়িতে। নিজের কাজ নিজে করে, খুব কম হলেও দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনতে হয়।

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কলকাতার হেড অফিসের কর্মী তপন ঠাকুরপুকুর থেকে যাতায়াত করে স্কুটারে। অফিসে ওর বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে মিহির বসু, সত্যজিত মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অশোক চন্দ। প্রসূন ব্যানার্জিও ওই ব্রাঞ্চেই আছে তবে 'সে তো দাদার মত।' বড়িষা স্পোর্টিং-এর সমীর দে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তরুণ তপনের বৈশিষ্ট ও সিনেমা দেখতে ভালবাসে না, দেখে না। আড্ডা ওর ধাতে সয় না। ওর কাছে লোভনীয় ওর গৃহকোণ, ওর পাড়া ও অবশ্যই মা-বাবার সান্নিধ্য।

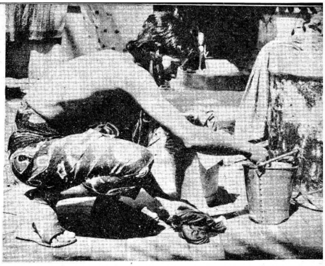












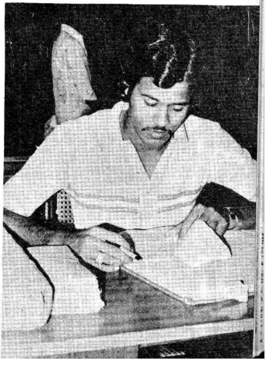
বাড়ির পরিবেশ তপনের বড় প্রিয়



ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী







মালদহে খেলাধূলায় কী হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহর থেকে দূরে গ্রাম-বাংলায় খেলাধুলোর প্রসারের জন্য সাম্প্রতিককালে কিছু উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেছে। দক্ষিণ বঙ্গ যদিও এবিষয়ে বেশ এগিয়েছিল, উত্তরবঙ্গও এখন পেছনে পড়ে নেই।

এই উত্তরবঙ্গর একটি জেলা · মালদহ। উত্তরবঙ্গের এই জেলাটিই কলকাতার সব থেকে কাছে—ট্রেনে বা বাসে একরাত্রির রাস্তা। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বছরে এই জেলার ক্রীড়া-নিয়ামক সংস্থা ডি এস এ ১৬ দফা কর্মসূচী নিয়ে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য নেমে পড়ে। বৎসরান্তে ডি এস এ সম্পাদক উদয় সান্যাল আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, এই এক বছরে তাদের আর্থিক সংগতি প্রায় ২৬ হাজার টাকা বেড়েছে। এর জন্য নিশ্চিন্ত-ভাবেই রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই এফ এ-র কাছে ডি এস এ কৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ আই এফ এ শীল্ডের ক্লাস্টার ম্যাচগুলি থেকে প্রায় ১৭ হাজার টাকা লাভ পাওয়া গেছে।

যদিও অভূতপূর্ব বন্যার জন্য শশীকান্ত আচার্য মেমোরিয়াল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেণ্ট করা যায়নি, তবু এরা নিজেদের স্টেডিয়ামটির সংস্কার ও সামান্য হলেও উন্নয়ন করেছেন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ার ব্যাপারে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। জেলার এম পি দীনেশ জোয়ারদার খেলাধুলোয় বিশেষ উৎসাহ দেখানোয় এদের সুবিধে হয়েছে। জেলা শাসক আর কে প্রসন্নন ডি এস এ-র সভাপতি এবং ক্রীড়ামোদী। ফলে স্পোর্টস কাউন্সিলের কাছ থেকে বেশি অনুদান আদায় করা গেছে।

অনেক জেলায় না থাকলেও এদের একটি সুইমিং পুল এবছরই চালু হলো। ফুটবলের পরই আয় সেখানে : বছরে প্রায় সতেরো হাজার টাকা। সাঁতার কোচিং ও জেলা সাঁতারে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫ হাজারের সামান্য বেশি।

ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিণ্টন, টেবল টেনিস-এর আন্তঃক্লাব প্রতি-যোগিতা ডি এস এ সম্পাদন করেছে। আন্তঃ-জেলা ফুটবলে এরা কোন স্থান না পেলেও ক্রিকেটের আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় জুনিয়র বিভাগে এবার তারা রানার্স—আপ হয়েছে। সি এ বি আয়োজিত জলপাইগুড়ি কোচিং ক্যাম্পে এদের চারজন নির্বাচিত হয় এবং দু'জন ৫০ টাকা মাসিক বৃত্তি পায়।

রাজ্য সাঁতারেও এবছরই প্রথম ২ জন তরুণ মালদা থেকে অংশ নেয়, একজন পঞ্চম হয়। এছাড়া রাজ্য বক্সিং লিগ গ্রামীণ ক্রীড়ায় এই জেলা থেকে অন্তত একজন সম্মান আনতে পেরেছে।

এই জেলার ফুটবল লিগে ২৫টি দল ও ৭টি স্কুল-কলেজ খেলে। অথচ স্পোর্টস কাউন্সিল অনুদান দিয়েছে মাত্র ৩০০ টাকা। আর টেবল টেনিসে সব থেকে বেশী ৭৮০ টাকা। এতে জেলা প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি দল (স্কুল-কলেজ সহ) অংশ নেয়।

তবে জেলা যাই উন্নতি করুক না কেন এদের বার্ষিক হিসেব পত্রে ২৫,৪৯০ টাকা 'সাময়িক অগ্রিম' খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে। অগ্রিমটা কেন তা বিশদ বলা হয়নি। যাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় ২ লাখ ১০ হাজার টাকার সামান্য বেশি (যার মধ্যে পুঁজি মাত্র হাজার চুয়াল্লিশ) সেখানে এত বড় সংখ্যার অগ্রিম কোন খাতে, তা ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।

এখন কি করছেন

স্বপন ঘোষ : 'বছর চারেক আগে প্রথমবার 'স্ট্রোক' এর ধাক্কা সামলে নিলেও আগের মত মনোবল আর নেই। দৈনন্দিন জীবনের অবিশ্রাম সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরাজয় আর ব্যর্থতা সব সময়ই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে, 'তুমি এখন ভীতু কাপুরুষ বাঙালী' —স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলি বললেন একজন ওলিম্পিয়ান ডাঃ রবীন ভট্ট। পেশায় সফল চিকিৎসক রবীনবাবু চল্লিশের দশকের শেষদিকে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে প্রমাণ করেছিলেন বক্সিং-এ বাংলার মানুষ ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কলকাতার ছেলে রবীনবাবুর জন্ম এই শহরেই ১৯২৫ সালে। রবীনবাবুর কিন্তু ছোটবেলার থেকেই অ্যাথলেটিক্সের দিকেই নজর বেশী ছিল। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বৌবাজার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র থাকাকালীন স্কুল স্পোর্টসে ওর নাম ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরতো। অ্যাথলেটিক্সে ওর দক্ষতা প্রমাণিত হলেও ১৯৩৮ সালে বক্সিং দলে নাম লেখালেন। এক বছর পরেই তৎকালীন খ্যাত-নামা মুকুল সংঘের হয়ে ছোটখাটো প্রতি-যোগিতায় নেমে প্রশংসা অর্জন করেন। ওই সময়েই জগাদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জে কে শীল ওরফে 'জগাদা' তখনকার কালে খ্যাতনামা বক্সার ছিলেন। রবীনবাবু 'স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচারে' যোগ দিয়ে অনুশীলন শুরু করেন।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেন। বক্সিং পুরোদমে চললেও বিজ্ঞানে স্নাতক (১৯৪৫) ডিগ্রী অর্জন করতে মেধাবী ছাত্র রবীনবাবুর কোন অসুবিধা হয়নি। এরই মধ্যে বাংলাতে ওর অল্পস্বল্প নাম হয়েছে। এই সময়ে ওর কাছে পরাজিতদের মধ্যে ছিলেন কে টি মিচেল (বার্মা) ডবু কিং (গোল্ডেন গ্লোবস) ভগবান দাস (আর্মি) এবং এস চৌধুরী (আন্তঃকলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ন)।

১৯৪৭ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আগেই মুষ্টিযোদ্ধা মহলে রবীনবাবু বহু উচ্চারিত নাম। ওখান থেকেই (এম বি বি এস ১৯৫৪) ডিগ্রী পাওয়ার মধ্যে অনেক অঘটন ঘটে গেছে। বাংলার হাজার ক্রীড়া-মোদী মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ আর্মি বক্সার কর্পোরাল পিজিয়ন (রয়াল সিগন্যালস) এই অল্পখ্যাত বাঙালী বীরের কাছে পরাজিত। জাতীয় আসরে এরপর রবীনবাবুর প্রবেশ আলোকিত সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে। আমেরিকান সেনাদলের স্টোকার জনসন বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিভিন্ন 'চ্যালেঞ্জ' বিজয়ী হয়ে। কিন্তু জনসন সাহেব রবীন-বাবুর সুচতুর বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশলের কাছে হারলেন। ফলে ফ্লাইওয়েটে জাতীয় চ্যাম্পি-য়নশিপ ওর অনুকূলে গেল। ১৯৪৮ সালে ফ্লাই ও ব্যাণ্টমে উনি ইণ্টার কলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিমুকুট অর্জন করেন।

১৯৪৮ সালে লণ্ডনে চতুর্দশ ওলিম্পিক গেমসে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে সেই দলটির যাওয়া স্থগিত থাকে। পুনরায় ট্রায়ালের মাধ্যমে নতুন দল নির্বাচিত হলে রবীনবাবু সেই দলেও রয়ে যান দক্ষতা ও সাফল্যের সুবাদে। এই ট্রায়ালে তার কাছে পরাজিতদের মধ্যে ছিলেন এস কোঠারী (বম্বে) আর হাউরাগান এবং ব্যামিন রোজারিও প্রমুখ খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। ওলিম্পিকে অবশ্য তৃতীয় রাউণ্ডেই পরাজিত হন, যার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় (ক্রীড়া বিষয়ক প্রবন্ধ) লিখেছেন।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস মেডিসিন সেমিনারে তার প্রবন্ধ 'হেড ইনজুরি অন বক্সিং' উচ্চ প্রশংসিত হয়। যে কোন উৎসাহী শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সাহায্য করতে রবীনবাবু প্রস্তুত আছেন।

পুলিশ একই রকম আছে ?

কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করছি, কলকাতা ময়দানে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলা নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলছেন। তাদের বেশির ভাগের মতে দোষী দর্শকরাই। কিন্তু দিনের পর দিন মাঠে গিয়ে বুঝলাম, শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যাদের, তাদের আচরণই দর্শকদের উচ্ছৃংখল হতে বাধ্য করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াবার পর যখন 'শান্তিরক্ষকরা' ঘোড়া নিয়ে লাইনের ভেতর ঢুকে পড়ে লাইন ভেঙে দেন, তখন মেজাজ খারাপ হতে বাধ্য। লাইনের ভেতর ঘোড়া নিয়ে ঢোকার সময় যদি ঘোড়ার পা কোন মানুষের পায়ের ওপর পড়ে, তাহলে তার কি অবস্থা হয় তা বোঝার ক্ষমতা আশা করি সকলেরই আছে। কোন দুঃসাহসী দর্শক যদি এর প্রতিবাদ করেন, তাহলে আইনের চোখে তিনি অপরাধী হন। গত ৪ জুলাই ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান খেলার দিন খেলার শেষে কিছু দর্শক উচ্ছৃংখল হয়ে উঠে প্রেস বক্সের ক্ষতি সাধন করতে গেলে কয়েকজন তরুণ তাদের বাধা দেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে ও বাধাদানকারীদেরই শায়েস্তা করে।

একান্ত অনুরোধ, দয়া করে এইসব অবিচার যেন শান্তিরক্ষকরা বন্ধ করেন। কারণ যাদের ওপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব, তারা যদি শান্তিভঙ্গের কারণ হন তাহলে অশান্তি চরম সীমায় উঠে, আর তাও প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

অমরেন্দু ঘোষ, ৪০, রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া, হুগলী।



মেয়েরা মাঠে কেন ?

আজকাল খেলার মাঠে যাওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এর প্রভাব বেশী। এর ঠিক কারণ বুঝে উঠতে পারছি না। অবশ্য মেয়েরা এখন বিভিন্ন খেলাধুলায় পুরুষদের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে মেয়েরা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যায় তাদের অধিকাংশেই ফুটবল খেলার কিছুই বোঝে না। যাই হোক, ইদানিংকালে সকালবেলায় প্র্যাকটিসের সময় মেয়েদের ভিড় করার কি কারণ থাকতে পারে? তারা কি সত্যিই প্র্যাকটিস দেখতে যান, না ফুটবলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যান সেটাই প্রশ্ন। এতদিন তো জানতাম ক্রিকেটারদের প্রতি মেয়েদের বিশেষ দুর্বলতার কথা। কিন্তু এখন দেখছি ফুটবলারাও ভাগ্যবান। ২৯ জুলাই ট্যাংরায় বামফ্রন্ট সরকারের এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জি, নীলেশ সরকার, অরুণ ঘোষ প্রমুখ অভিজ্ঞ ফুটবল খেলোয়াড়রা। সেদিন প্রদীপ ব্যানার্জি বললেন, যে সমস্ত মেয়েরা সকালে প্র্যাকটিস দেখতে যান তাদের কাছে আমার অনুরোধ—আপনারা ওই সময় মাঠে যাবেন না, এতে খেলোয়াড়দের অনেক অসুবিধা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বললেন, কোচ অরুণ ঘোষ সাব্বির আলিকে বাঁ পায়ে শট করতে বললেন, কিন্তু সাব্বির আলির বাঁ পায়ের শট দুর্বল বলে তিনি শট করলেন না। কারণ যদি মিস কিক হয় তবে উপস্থিত মেয়েরা নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন। অথচ কোচের মুখের উপর কোন কথাও বলতে পারেন না। তাই বললেন, অরুণদা গেম শুরু করে দিজিয়ে। যাতে তার দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। এতেই বুঝতে পারছেন খেলোয়াড়দের কি দারুণ ক্ষতি হচ্ছে। আমি সত্যিই ফুটবলকে ভালোবাসি বলেই প্রদীপদার গলায় গলা মিলিয়ে আপনাদের কাছে (মেয়েদের) অনুরোধ করছি আপনারা সকালে মাঠে যাবেন না এবং সত্যিই যারা ফুটবল খেলাকে বোঝেন এবং ভালোবাসেন তারাই মাঠে যাবেন সত্যিকারের খেলা দেখতে।

সঞ্জয় দে, প্রভুরাম সরকার লেন, ট্যাংরা।

ভেবেচিন্তে লিখুন

১০ আগস্ট মৌসুমী সান্যালের চিঠি পড়ে বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, তিনি কি অন্তর্যামী? তিনি কি ফুটবল খেলা বোঝেন, নাকি কারোর প্ররোচনায় চিঠিটি লিখেছেন? মৌসুমী দেবী লিখেছেন, মোহনবাগান/ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি ড্র হওয়াতে মোহনবাগানের সকলে খুশী। আপনাকে জানাই—মোহনবাগানের সকলে খুশী নন, কারণ ওই গুরুত্বপূর্ণ খেলায় উভয় দলই জিতবার আশা নিয়ে মাঠে নামে। দ্বিতীয়ত এই খেলা দেখে বিদেশদা ভালো খেলোয়াড় নন এইটাই বলতে চেয়েছেন। তাহলে কিন্তু সুরজিতদাকেও ওই একই ফাঁদে আপনার ফেলা উচিত। শ্রীমতী সান্যাল লিখেছেন, সুরজিতদাকে অকেজো করার আদেশ প্রদীপদা কি করে দিলেন? এ থেকে বোঝা গেল বর্তমান দিনের ফুটবল সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বেশ কম। প্রতিপক্ষের যে খেলোয়াড়টি সবচেয়ে মারাত্মক তাকে অকেজো করার জন্য বলপ্রয়োগ ব্যতীত যেকোন স্ট্র্যাটেজি যে কোন কোচ নেবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

আপনি মোহনবাগানের প্রতাপদাকেই একমাত্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ভালো কথা। কিন্তু যে অবস্থায় মানস ভাইয়া গোল করেছেন সেটি কি ধন্যবাদের যোগ্য নয়?

নিবেদিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

পাঠকের কলমে

মহমেডান স্পোর্টিংকে তাচ্ছিল্য কেন ?

৪ আগস্ট যে খেলা হলো তার ধারাভাষ্যকারদের সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে চাই। ইস্টবেঙ্গল বড় দল। বড় গলায় বলার মতো অনেক কীর্তি কথা তাদের। তাই বলে মহমেডান কি একেবারেই তৃতীয় শক্তির দল? শুরু থেকে ধারাভাষ্যকাররা মহমেডানকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেই শুধু যে রাখলেন তাই নয় পঞ্চমুখে ইস্টবেঙ্গলের এমন প্রশংসা শুরু করলেন তাঁরা—যা বড়ই শ্রুতিকটু লাগছিল শ্রোতাদের কাছে, যেখানে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থক সংখ্যাও একেবারে 'নগণ্য' নয়। মহমেডান সীমানাতে বল গেলেই তারা এমন চীৎকার জুড়ে দিচ্ছিলেন যেন গোল বুঝি হয়েই গেছে। উল্টো ব্যাপার ঘটছিল মহমেডানের আক্রমণের সময়। মিনমিনে গলায় দু'কথাতে সেরে দিতে পারলেই যেন বাঁচেন তারা। ভাষ্যকারদের মতোই মহমেডানকে 'তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবো' এই মনোভাবের শিকার হতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দেরও। ফল কি হয়েছে তা আজ সকলেরই জানা।

আকাশবাণী অন্তত বড় খেলায় নিরপেক্ষ থাকবে এটাই আশা করা উচিত।

সানারুল মণ্ডল, সন্তোষ সিংহ, পার্থ পাণ্ডে, ভৃগুরাম ও নরকিশোর গরাই, বিবেকানন্দ মেডিকেল কলেজ, চতুর্থ বর্ষ, সাঁইথিয়া, বীরভূম।

কিছু নিবেদন

খেলার আসর পূর্বে প্রতি শুক্রবার হাতে পেয়ে যেতাম, কিন্তু বর্তমানে পেতে দেরি হচ্ছে। যাতে শুক্রবারেই পাই সেই ব্যবস্থা করুন।

বর্তমানে বিজ্ঞাপন খেলার আসরের বেশ কয়েক পৃষ্ঠা দখল করে রাখছে। বিজ্ঞাপন-এর জন্য আলাদা পৃষ্ঠা করলে ভাল হয়।

বিদেশের এবং ভারতের অন্যান্য জায়গার খেলার খবর অনেক দেরিতে পাচ্ছি। খবরগুলো তাড়াতাড়ি পাবার কি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না?

সম্পাদকের লেখা আরও খানিকটা জায়গা জুড়ে হলে ভাল হয়।

'শব্দ-জব্দ' বিভাগটি বর্তমানে কেবল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঐ বিভাগটি প্রত্যেকের জন্য খুলে দেওয়া হোক।

খেলাধূলা সম্বন্ধীয় গল্প বা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে ছাপলে পত্রিকার প্রচার আরও বাড়বে বলে আশা রাখি।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অনেক খেলোয়াড়ই তো দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন। 'পাদ-প্রদীপের আলোয়' বিভাগটির মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধেও জানতে চাই।

খেলার আসরে কম করে আরও দু'টি পৃষ্ঠা রঙিন ছবির জন্য বরাদ্দ করুন।

খেলার আসরের মাধ্যমে ছোট টিমের ফুটবল খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানতে চাই।

রামু সাহা, রেলওয়ে কলোনী, বরাকর, বর্ধমান।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, ফুটবল লিগ আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তিন প্রধানের এক শ্রেণীর সমর্থকদের পতাকা তোলার সমারোহ (এর মধ্যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্যই বেশী)। এই বছর তিন প্রধানের সমর্থকরা কে কত বেশী পতাকা তুলতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর প্রভাব শুধু কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরতলী ও মফঃস্বলেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই পতাকা তোলার প্রবণতা এখনই যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে অচিরেই, কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল অর্থাৎ ভিন্নমত পোষণকারী দলের ছেলে ভিন্ন পাড়ায় গেলে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসত না, মারাও যেত, তেমনি অবস্থা ধারণ করবে। পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে যাতে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, এইসব পতাকা বাজেয়াপ্ত করুন, আর যারা পতাকা তুলবে তাদের গ্রেফতার করুন। বাজারে পতাকা বিক্রয় নিষিদ্ধ করুন, যদি এই সব নোংরামো বন্ধ করা না হয়, তাহলে একদিন হয়ত খেলাই বন্ধ হয়ে যাবে।

শিশির সমাজদার, রঘুনাথপুর, কলকাতা-৫৯।

রাজনৈতিক দলের মত

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিন প্রধানের সমর্থকদের আচরণ বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের মতো নয় কি? অর্থাৎ একদল জয়ী হলে তাদের আনন্দ উৎসব এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপে



অপর দলের সমর্থকদের মনে ফেলে অপমানের কালো ছায়া। স্বভাবতই তখন বন্ধুত্ব বলে কিছু থাকে না ওই পরিবেশে, সৃষ্টি হয় হিংস্রতা এবং অশোভন কথাবার্তা। এই অকারণ উত্তেজনায় কিছু পথচারীও কিন্তু রেহাই পান না।

উৎসাহী ক্রীড়ামোদীদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অকারণ উত্তেজনা প্রশমিত করুন এবং ফুটবল খেলার মানের উন্নতি হওয়ার পথে সহযোগিতা করুন।

নন্দন চৌধুরী, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩।

এ কোন্ ডেভিড

কিছুটা বিবেক তাড়িত হয়ে এই পত্রটি লিখলাম।

৪।৮।৭৯ তারিখে টি ভি-তে ইস্ট-বেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটি দেখছিলাম। সম্ভবত কোন খেলোয়াড় আহত হয়ে পড়ায় একবার খেলাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল দলের ডেভিড উইলিয়ামস হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়কে লাথি মারলেন। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরাও খেলা দেখছিল। পরের দিন সকালে দেখলাম ৮/৯ বছরের দুটি ছেলে বাড়ির উঠোনে ডেভিড কিভাবে লাথি মেরেছিল সেটা অনুশীলন করছে।

সবচেয়ে মজার কথা, পরের দিন সংবাদপত্রে এ নিয়ে কিছু লেখা হল না। ঘটনাটা যখন ঘটল তখন রেফারি তাকে কিছু বললেন না। ভাষ্যকাররাও নীরব রইলেন। জানি এর পরেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই খেলোয়াড়দের ছবি ছাপা হবে, জীবনী বেরুবে, কিন্তু তাতে তাদের আচার ব্যবহারের এই সমস্ত ঘটনা থাকবে না। কারণ তারা মস্ত বড় খেলোয়াড়, বড় দলে খেলেন, খেলা পাগল ছেলেমেয়েদের তারা আদর্শ।

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, শরৎ সরণী, হুগলী।

কি করলো ডেভিড, মিহির, সাব্বির

৭ জুলাই 'ফুটবল মহারণে' কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলের দুই প্রধান সেনাপতি যখন প্রত্যেকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেন—উভয়ে একটি বারে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়ে প্রস্তুত হতে শুরু করলেন আই এফ এ-র নতুন নিয়মানুসারে দ্বিতীয় মহারণের জন্য, ঠিক তখনি বহু রথী, মহারথী সমৃদ্ধ এবং আমার মত হাজার হাজার ফুটবল প্রেমীর সমর্থন পুষ্ট ইস্টবেঙ্গল ৪ আগস্ট আর এক কুশলী যোদ্ধার কাছে এক পয়েন্ট দিয়ে লিগ জয়ের প্রশস্ত পথে মুখ থুবড়ে পড়লো। যদিও ওই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখার সুযোগ আমার পক্ষেসম্ভব হয়নি, তবে রেডিওর ধারে কান পেতে খেলার শেষ লগ্ন অবধি শোনার পর শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুতেই পাচ্ছি না। কি করলো ডেভিড, মিহির, সাব্বির? ৩ আগস্ট সংখ্যা 'খেলার আসর'-এ পি কে এবং প্রশান্ত ব্যানার্জি ও অগণিত সমর্থকের আশাকে নস্যাৎ করে দিল ওই নামী তারকারা। পূর্বসূরীদের অনুসরণ করতে চায় উত্তরসূরীরা। তাই ভয় লাগে আগামীদিনের ভাবী ফুটবলাররা ওই নামী তারকাদের মত মিস করতে শিখবে না তো? সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই অমল দত্তকে (মহঃ কোচ), সুরজিত এবং প্রশান্তকে। আর সবশেষে অমিত গুহের আগামী দিনগুলির এবং মনোরঞ্জনের শীঘ্র স্বাভাবিক সুস্থতা কামনা করি।

বিমান ভট্টাচার্য, পশ্চিম দোগাছী, নদীয়া।

কোন্ কোন্ ম্যাচ সেরা

আমরা যারা কলকাতার বাইরে থাকি কিন্তু কলকাতার ফুটবল লিগের পোকা, তারা দুধের সাধ ঘোলে মেটাই খবরের কাগজের রিপোর্ট এবং ধারাবিবরণী থেকে। এবার বড় দলের প্রতিটি ম্যাচের বাংলা ধারাবিবরণী শুনে ফুটবল লিগের ছবিটা বেশ পরিষ্কার। আমার মতে এবারে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ম্যাচ—জর্জ টেলিগ্রাফ-মহমেডান, ইস্টবেঙ্গল-খিদিরপুর, ইস্টবেঙ্গল-সালকিয়া ফ্রেণ্ডস (প্রথমার্ধে)।

আপনারা যারা কলকাতার লিগের নিয়মিত দর্শক তারা বলুন না খেলার আসরের মাধ্যমে, এবছরের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি লিগ ম্যাচ কোন্ কোন্‌টি। অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীতে।

প্রবীর, সুবীর, উৎপল,
জেমকো-জামশেদপুর-৪

দূরদর্শনে ওভারল্যাপ

২১ জুলাই মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটা দূরদর্শনের মাধ্যমে দেখছিলাম। ভাষ্যকার সমর ব্যানার্জি বললেন 'কম্পটন দত্ত সুন্দর ওভারল্যাপ করে চলে গেল।' আমি ফুটবলের অত খুঁটিনাটি বুঝতে পারি না, তবে ফুটবল খেলা দেখতে খুব ভালবাসি; আর বড় খেলা হলে তো কথাই নেই। ওভারল্যাপটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, সেটা এখন ভাল করে বুঝতে পেরেছি। হাফ টাইমে ও খেলার শেষে 'এক্সপার্ট কমেণ্টেটর' হিসেবে অতীতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক অরুণ সিনহাকে আনা হল। তাকে মাঝখানে বসিয়ে দুই কমেণ্টেটর সুকুমার সমাজপতি এবং সমর ব্যানার্জি তাকে যেভাবে ওভারল্যাপ করছিলেন, তাই দেখে 'ওভারল্যাপ' সম্বন্ধে আমার প্রচুর ধারণা হয়ে গেছে।

সুকুমার সমাজপতি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা অরুণদা, এক সময়ে দেখলাম বিদেশ রাইট আউটে এবং মানস লেফট আউটে অনেকক্ষণ ধরে খেলছে; খেলতে খেলতে ইন্টারচেঞ্জ করে খেলোয়াড়রা অন্য জায়গায় আসে আবার তার নিজের জায়গায় চলে যায়।' অরুণবাবু সবে উত্তর দিচ্ছেন, আমিও সাগ্রহে শোনার অপেক্ষায় আছি—কিছুটা বলার পরই সমর ব্যানার্জি অরুণবাবুকে ওভারল্যাপ করে আবার একটা প্রশ্ন করে বসলেন।

এইভাবে সুকুমার সমাজপতি ও সমর ব্যানার্জি তাকে ক্রমান্বয়ে ওভারল্যাপ করে গেলেন—খেলার উপর এক্সপার্ট কমেণ্ট সিকেয় উঠলো। এই রকম ওভারল্যাপ করতে করতে আলোচনার বিষয়বস্তু চলে গেল 'কাচ দেম ইয়ং'-এ।

তাই বলি, দূরদর্শনের কল্যাণে 'ওভার-ল্যাপ' জিনিষটা এযাত্রা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি।

ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, কাঁকিনাড়া জুট মিলস,

সব দোষ কি ডিফেণ্ডারদের?

সাত জুলাই-এর খেলায় মোহনবাগানের বিপক্ষে চিন্ময় চ্যাটার্জি সামান্য একটি ভুল



ব্যাক পাসের জন্য চিন্ময়দাকে যেভাবে বদনাম করা হয়েছে, তা সত্যি খুব অপমানজনক। অথচ চিন্ময়দা ছাড়া গোলটির জন্য সত্যজিৎ মিত্র, গুরদেব সিং এবং ভাস্কর গাঙ্গুলি প্রত্যেককেই আংশিক দায়ী করা যায়। অবশ্য মানসদা অতি তৎপরতার সঙ্গে গোলটি করে-ছিলেন।

কিন্তু ৪ আগস্টে মহমেডানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল যে ভাঙা ডিফেন্স নিয়ে খেলে গেল তা তুলনাহীন। তার সুনাম একবারও কেউ করলেন না। ফরোয়ার্ড লাইনে সুরজিৎ সেনগুপ্ত ছাড়া মিহির বসু, সাব্বির আলি এবং ডেভিড উইলিয়ামস যে গণ্ডা গণ্ডা গোল মিস করলেন—কই তাদের নামে তো একটিও প্রতিবাদ দেখলাম না? তাদের বাড়ির দেওয়ালে একটিও পোস্টার পড়ল না। সব খবরের কাগজ এবং পত্রিকা তাদের দোষ এড়িয়ে গেলেন। এটা সত্যিই খুব অন্যায়।

প্রদীপ কুমার ব্যানার্জি, জামশেদপুর

মেয়ে ফুটবলাররা গ্রামের দিকে দেখুন

আমরা অর্থাৎ গ্রামের মেয়েরা কি শুক্লা দত্তের মত ফুটবলার হতে পারব না? এই প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে গত ৯ জুনের খেলার আসরে শুক্লা দত্তের কথা পড়ে। আমার খুব উৎসাহ ফুটবল খেলার কিন্তু আমরা এখানে তেমন উৎসাহ পাই না। কয়েক-দিন আগে আমি ও আমার এক বন্ধু আমাদের বাড়ির সামনে ফুটবল খেলছিলাম, কিন্তু বিরূপ মন্তব্য শুনে আমরা আর খেলি না। শুধু লোকেদের দোষ দেব কেন? আমাদের দোষ আছে, সেটা হল খেলাটা আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে খেলি না। যাই হোক, আমি মহিলা ফুটবলের যিনি অধিনায়িকা এবং অন্যান্যদের জানাই তারা যেন আমাদের অর্থাৎ গ্রামের মেয়েদের প্রতি একটু নজর দেন।

উদিতা দাশগুপ্তা, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

জামাডোবা ও ডিগয়াডীহ এক নয়

খেলার আসরে প্রায়ই ধানবাদের খেলা-ধূলার ব্যাপারে অমল ত্রিবেদীর লেখা পড়ি। তিনি বরাবর জামাডোবার টাটা কোলিয়ারীস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের 'ডিগয়াডীহ স্টেডিয়াম'-কে 'জামাডোবা স্টেডিয়াম' বলে উল্লেখ করেন। আশাকরি এরপর তিনি ভুল শুধরে নেবেন।

বিপ্লব ব্যানার্জি, ডিগয়াডীহ কোলিয়ারী,
পোঃ-জিয়ালগোড়া, জেলা-ধানবাদ।

ক্রিকেটের পিছনে সময় নষ্ট নয়

খেলার আসর বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় মন্ত্রীরাও খেলার মাঠে 'কিসের টানে' লেখায় প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা সুব্রতবাবুর মতের সঙ্গে (১) ঘৃণা করি, (২) ক্ষমতা থাকলে আইন করে বন্ধ করে দিতাম' এই কথা দুটি ছাড়া বাকি বক্তব্যের সঙ্গে প্রায় একমত। তবে আমার এই চিঠিতে আমি কিছু ভিন্ন কথা বলতে চেষ্টা করছি। এই খেলা যে বাড়িতে বা অফিসে বসে রেডিওতে শোনে, যে মাঠে গিয়ে প্রত্যক্ষ করে এবং যে খেলে বা খেলতে আগ্রহী তাদের যে কত অলস করে দেয়, জাতীয় জীবনের উন্নতিতে তারা কি বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা কল্পনার বাইরে।

উদাহরণ হিসাবে প্রথমেই বলি, যেমন কোন না কোন অফিসে আমাদের প্রয়োজন সব সময়েই থাকে। প্রয়োজনে অফিসে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো আমাদের অভ্যাস আছে, কিন্তু যখন দেখি, যার দ্বারা আমাদের কাজটি সম্পন্ন হবে তিনি দশটার বদলে বারোটায় হাজিরা দিলেন। যদিও বা অফিসে এলেন তাও আবার হাজিরা খাতায় সই করেই রেডিও নিয়ে কোথায় বেপাত্তা। তখন আমাদের অবস্থা কি রকম হতে পারে তা যারা ভুক্তভোগী তারাই কল্পনা করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত বাড়িতে বসে যারা রেডিও শোনে বা টেলিভিসন দেখে, সেই ক্রিকেট-প্রেমীদের কাছে ওই পাঁচদিন কোন কাজ আশা করা বৃথা।

তৃতীয়ত 'গরীবের আবার ঘোড়ার রোগ কেন' এই প্রবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলতে হয় যে, এই খেলা দেখতে গিয়ে আমাদের অনেকের সারা মাসের রেশনে টান পড়ে।

যে খেলার পেছনে আমরা বৃথা সময় নষ্ট করি, সে খেলার আন্তর্জাতিকতা মাত্র পাঁচ সাতটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ক্রিকেটের পেছনে সময় নষ্ট না করে অন্যান্য গেমস বা অ্যাথলেটিক্সের পেছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে জাতীয় সম্মান অর্জনের চেষ্টা করতে পারি।

সঞ্জিত কুমার ঘোষ, পাতুলিয়া, বন্দীপুর।

[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার গিফট চেক পাবেন কাঁকিনাড়ার ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়]



ডাকটিকিটে খেলাধূলা

তপন রায়ঃ অন্যান্য বারের মত মস্কো ওলিম্পিকেও জিমন্যাস্টিক্সের জমজমাট আসর বসবে। ১৯৮০ সালের ২০ থেকে ২৫ জুলাই এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হবে মস্কোর লুঝ্নিকি স্টেডিয়ামের 'প্যালেস অফ স্পোর্টস' এ। মস্কো ওলিম্পিক উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ (আপাতত) ডাকটিকিট সিরিজে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জিমন্যাস্টিক্সের পুরুষ ও মহিলাদের ইভেন্টগুলি এই সিরিজের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ডাকটিকিটে রূপায়িত হয়েছে। এই ডাকটিকিট-গুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি প্রধান অংশ ওলিম্পিক সংগঠনী কমিটির তহবিলে যাচ্ছে। কমিটিও এই অর্থ ওলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে শুরু করে দিয়েছে।

৪+২ কোপেক দামের ডাকটিকিটে একজন মহিলা জিমন্যাস্টকে ফ্রি-স্টাইল ইভেন্টে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। প্রায়শই এই ইভেন্টকে ফ্লোর এক্সারসাইজ আখ্যা দেওয়া হয়। কোনরকম সাজসরঞ্জাম ছাড়াই জনপ্রিয় ইভেন্টটি সম্পন্ন হয় যা জিমন্যাস্টিক্সের অন্যান্য ইভেন্টের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়।

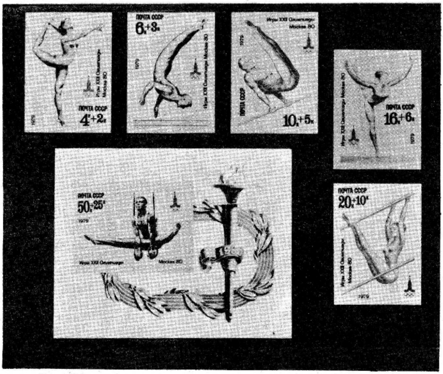
৬+৩ কোপেক মূল্যের ডাকটিকিটে পুরুষদের প্যারালাল বার ইভেন্টকে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ধরনের ইভেন্টে বারের ওপর ১১টি বিভিন্ন কৌশল বা ব্যালেন্স জিমন্যাস্টকে প্রদর্শন করতে হয়। ক্রস বার ইভেন্টকে বাস্তব-রূপ দান করা হয়েছে ১০+৫ কোপেক ডাকটিকিটে।

একজন মহিলা প্রতিযোগীকে বিম ব্যালেন্স এক্সারসাইজে রত দেখানো হয়েছে ১৬+৬ কোপেক মূল্যের ডাকটিকিটে। একমাত্র মহিলারাই এই ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাধারণত '৮০ থেকে ১০৫ সেকেণ্ড ধরে এই ধরনের এক্সারসাইজ চলে।

১৯৩৬ সালের ওলিম্পিকে যে অসমতল প্যারালাল বার ইভেন্ট শুরু হয়েছিল তার জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। তাই এই সিরিজের ২০+১০ কোপেক দামের ডাক-টিকিটে শুধু মহিলাদের এই ইভেন্ট রূপায়িত হয়েছে। গতবারের ওলিম্পিকে রোমানিয়ার নাদিয়া কোমেনচি এই ইভেন্টে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

৫০+২৫ কোপেক মূল্যের সুভ্যেনির শিটে পুরুষদের রিং-এর খেলা দেখানো হয়েছে। এই ইভেন্টে ছাদ থেকে ঝোলানো কাঠের রিংগুলি ধরে শরীরের বিভিন্ন ব্যালেন্স প্রদর্শন করতে হয়। এছাড়াও সুভ্যেনির শিটে লতাগুল্মের তোড়ার মধ্যে ওলিম্পিক মশালকেও স্থান দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের ২১ মার্চ প্রকাশিত সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ডাকটিকিটগুলি জিমন্যাস্টিক্সের সৌন্দর্য, উত্তেজনা, কমনীয়তা ও শিহরণের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটায়।



বলো দেখি

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১। ভারতের বীর তিনি
জয় করে ঘু সোঘু সি
প্রথম অর্জুন পান
মুখখানি হাসিখুশী

২। টেস্ট ম্যাচে দুইশত রান
ভারতে প্রথম কে পান?

৩। বাংলা মায়ের ছেলে গড়ের মাঠে যান
গোরাদের খেলা দেখে দারুণ মজা পান
শেখেন খেলা আনেন ধরে স্কুলের নাম হেয়ার
সেখানেতে গড়ে ওঠে ফুটবল player।

৪। গড়ের মাঠে হকির খেলা
কাপের নাম বাইটন
বল দেখি কাহার দেওয়া,
বাইটন কেবা হন?



উত্তর :—১। বুডী ডিসুজা (১৯৬১)। ২। পলি উম্রিগড় (১৯৫৫-৫৬), ৩। নগেন্দ্র সর্বাধিকারী, ৪। টি ডি বাইটন (বাংলা সরকারের আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার)

শব্দ জব্দ

ওয়াং লিং চেন,
দ্বাদশ শ্রেণী, কৃষ্ণভাবিনী
নারীশিক্ষা মন্দির,
পোঃ—চন্দননগর, জেলা—হুগলী।

পাশাপাশি

১। গতবছর দূরপ্রাচ্য সফরে সিঙ্গাপুর একাদশের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের এই খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

২। ১৯২৭ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব দখল করেছিলেন এই দাবাড়ু।

৩। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ফেডারেশন কাপের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে এই ট্রফির খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল একই সময়ে।

৪। ১৯৭২ সালে এই ফুটবলারের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'স্যার আশুতোষ মুখার্জি' ট্রফি পায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে জয়ী হয়ে।

৫। এবছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রাঁ প্রি টেনিসের ডাবলসে বিজয়ীদের একজন

৬। ১৯৬৭ সালে ইউরোপিয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার হয়েছিলেন।

৮। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন ওলিম্পিকের সেমি-ফাইনালিস্ট ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক।

৯। নম্র ও শান্তশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কলকাতার মাঠে সকলের প্রিয়পাত্র এই সুদর্শন স্ট্রাইকারটি।

১০। বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট জগতের উজ্জ্বল তারকা।

উপর-নীচ

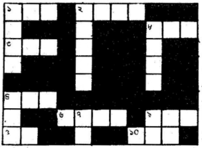
১। রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলতে নেমেই দ্বিশত রানের বড়সড় ইনিংস খেলেছিলেন এই ক্ষুদে ব্যাটসম্যান।

২। গতবারে আই এফ এ শিল্ডের অন্যতম ভাগীদার আরারাতের পক্ষে ফাইনালে মোহনবাগানের বিপক্ষে একটি গোল করেছিলেন।

৪। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে অতি পরিচিত ভারতীয় নাম।

৭। খেলা পুনরানুষ্ঠানের পরিভাষা।

৮। সোয়ার্ভিং কিক করতে ভারতে এই খেলোয়াড়ের জুড়ি নেই।



শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা

শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃষ্টি ও তার প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের। তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তারা যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তারা পুরস্কার স্বরূপ পঁচিশ টাকা পাবেন। তবে নিজ নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম লিখতে ভুলবেন না।

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান।

নাম ____________

অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

বিদ্যালয় ____________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ____________

বিদ্যালয়ের সীলমোহর ____________

আন্তঃ ইস্পাত 'ক্রশ- কাণ্ট্রি' দৌড়ে শিবনাথ সিং-এর রেকর্ড

সংবাদদাতা : ১২ আগস্ট দুর্গাপুরে আন্তঃ ইস্পাত 'ক্রশ-কাণ্ট্রি' দৌড় প্রতিযোগিতায় টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল দলের শিবনাথ সিং প্রথম হন। নেহরু স্টেডিয়াম থেকে দৌড় শুরু করে দুর্গাপুর শহর ও এম এ এম সি কলোনির মধ্যবর্তী অসমতল ও বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল সাড়ে চৌদ্দ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে পুনরায় নেহরু স্টেডিয়ামে আসতে খ্যাতনামা দৌড়বীর শিবনাথ সিং-এর সময় লাগে ৪৩ মিনিট ১৯.০ সেকেণ্ড। এটি আন্তঃ ইস্পাত রেকর্ড এবং ভারতেও এর আগে কেউ এত কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেননি। দ্বিতীয় হন টাটার টি টি জন (৪৫ মিনিট ০৫ সেকেণ্ড) ও তৃতীয় রাউরকেল্লা স্টিলের টি কে টিরকে (৪৫ মিনিট ৩৯.০ সেকেণ্ড)। এই প্রতিযোগিতায় ৩৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। প্রথম দশজনকে নিয়ে স্টিল প্ল্যাণ্ট দল গঠিত হয়েছে। এরা 'ওপেন ন্যাশনালে' অংশ নেবেন।

বিশ্বের প্রথম সারির দূরপাল্লার দৌড়বীর শিবনাথ সিং এবছরই সেনাবাহিনী থেকে টাটা স্টিলে যোগ দিয়েছেন। এবং এটাই তার প্রথম আন্তঃ ইস্পাত প্রতিযোগিতা। টাটার কোচ কেন বোসেন এখন শিবনাথের প্রশিক্ষক। তিনি আশা করেন মস্কো ওলিম্পিকে শিবনাথ ভালো ফল করবে এবং সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে শিবনাথ প্রচণ্ড অনুশীলনও করছে।

শিবনাথ সিং-এর দৌড় দেখবার জন্য দুর্গাপুরবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং দৌড় পথের পার্শ্বে দর্শকরা উৎসাহ দেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিমাই মিত্র। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী মিত্র। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন সেণ্ট্রাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যাণ্ট।

শারদীয়া 'খেলার আসরে'

সুব্রত সরকার

লিখেছেন—চারবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বর্গ-কে নিয়ে। এবার উইম্বলডনে গিয়ে কেমন দেখেছেন তিনি বর্গ-কে।

আমার সারামাসের রোজগারের টাকাটা এক্ষুনি হাতে পেলাম। রোজগার হল কী ভাবে ?



ইউকোব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে।

বছর পাঁচেক আগে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কিছু আগে, আমার একমাত্র চিন্তা ছিল কীভাবে অবসর নেওয়ার পরে মাসে মাসে রোজগারের একটা পাকা বন্দোবস্ত করা যায়।

পরামর্শের জন্য **ইউকোব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হলাম।**

ওঁরা বল্লেন, 'এতে ভাবনা কি ? আপনি তো আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় থেকেই রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন।' ওঁরাই পরামর্শ দিলেন আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য টাকা ওঁদের ফিক্সড ডিপোজিট স্কীমে জমা দিতে।

এর উপর বছরে ৯% সুদ পাওয়া যায়, কাজেই মাসে মাসে ভালো টাকাই হাতে আসবে।

এখন প্রতি মাসে একবার করে **ইউকোব্যাঙ্ক** থেকে হাতে পাই মাসের রোজগারের টাকাটা এবং উপরি পাওনা আগামী দিনের নিরাপত্তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
লাভজনক জমা প্রকল্প

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্কীম
ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম
ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীম
রিকারিং ডিপোজিট স্কীম
গ্রো ইওর মানি স্কীম (কুবের যোজনা)
টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বচৎ যোজনা)
মান্থলি পেনশন স্কীম

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-40/79 Ben

আমেরিকায় কেমন আছেন ক্রুয়ফ ?



যোহান ক্রুয়ফ

বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার যোহান ক্রুয়ফ এখন আমেরিকায়। ওখানে লস এঞ্জেলস্ অ্যাজটেক দলের হয়ে খেলার জন্য বার্ষিক প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় দু'বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া কথা হয়েছে, যদি দর্শক সংখ্যা বাড়ে, তাহলে তার জন্য একটা রয়্যালটি দেওয়া হবে।

আমেরিকায় ফুটবল ততটা জনপ্রিয় নয়। ১৪ বছর ইউরোপীয় ফুটবলের উত্তপ্ত আসর ছেড়ে আমেরিকায় কেমন কাটাচ্ছেন ক্রুয়ফ ? স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'দিব্যি আছি, ভালো আছি। ইউরোপে থাকতে প্রতি সপ্তাহে একটা করে খেলা, লাখ দশেক দর্শকের রক্ত হিম করা চিৎকার, যখন তখন টেলিফোনে হুমকি, কিডন্যাপ করা হবে বলে ভয় দেখানো, তার চেয়ে লস এঞ্জেলস অনেক ভালো। মোটমাট খেলতে হবে ত্রিশটা ম্যাচ। রাস্তাঘাটে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারি, বেশ খুশী মনেই আছি।'

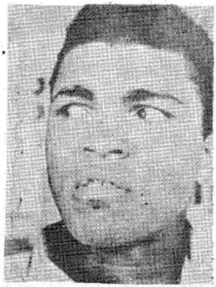
কয়েকমাস আগে ক্রুয়ফ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ফুটবল জগত থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ঠিক করেছিলেন নিজের ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করে এরপর থেকে কাটাবেন। কিন্তু বিধি বাম, ব্যবসায়ে বাজে ইনভেস্টমেন্ট, বিজনেস ম্যানেজারের সঙ্গে অবনিবনা তাকে আবার ফুটবল মাঠে ফিরিয়ে এনেছে। ক্রুয়ফ বলেছেন, 'ফুটবলের কাছ থেকে আমার অনেক কিছু পাওনা আছে, আর সে সব পাওনার আর্থিক দিকটা মেটাতে পারে একমাত্র আমেরিকা।'

ক্রুয়ফ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন, পেলের মতই তিনি বলেন, 'ফুটবল স্টার অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু স্টারদেরও স্টার থাকে ; আমি নিজে তাই।'

খেলা থেকে অবসর ঘোষণার পর প্রায় ছ'মাস বসে থেকে আমেরিকায় এসে প্রথম খেলাতেই মাত্র সাত মিনিট খেলে দুটো গোল করেছেন। সাতটি খেলায় তার গোলের সংখ্যা পাঁচ, আর আরো পাঁচটি গোলের নিশ্চিত সুযোগ তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। নিজের পজিশন মিডফিল্ডে, তবে স্ট্রাইকার কিম্বা ফরোয়ার্ড লাইনের যে কোন অবস্থানে খেলায় সমান দক্ষ। ক্রুয়ফের গত ১৪ বছর খেলোয়াড় জীবনের মধ্যে ১০ বছর যার কাছে তালিম পেয়েছেন, সেই কোচ রাইনাস মিচেলের মতে ক্রুয়ফের বর্তমান দল অ্যাজটেক তথা আমেরিকা ক্রুয়ফকে পেয়ে ফুটবলেও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হল। অর্থাৎ বিপক্ষ দলের কাছে ক্রুয়ফের উপস্থিতি এ্যাটম বমের মতই বিপজ্জনক।

এখানে ওখানে

বত্রিশ বছর বয়সী উচ্চতায় পাঁচফুট ন'ইঞ্চি দেড়শো পাউণ্ড ওজনের এই হাসিখুশী খেলোয়াড়টি অবশ্য সুযোগ পেলেই প্র্যাকটিসে ফাঁকি মারেন। তবে তার কথা, 'পেলে এসে আমেরিকার ফুটবলের ৬০ শতাংশ পোটেনশিয়ালিটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমি তার ওপরে আরো পনেরো শতাংশ বাড়িয়ে দেবো।'


মহম্মদ আলি

ফিল্মস্টার মহম্মদ আলি ?

মহম্মদ আলি বক্সিং জগত থেকে অবসর নেবার পর এবার কি ফিল্মে নামবেন ? প্রকাশ মেহেরা নামে এক ভারতীয় ফিল্মে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আলিকে। ছবিটি তোলা হবে ত্রিনিদাদে।

ছবির কাহিনীর ঘটনাকাল গত শতাব্দী। ত্রিনিদাদে আগত একটি ভারতীয় ও আফ্রিকান পরিবার নতুন দেশে এসে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে কিভাবে নিজেদের নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, তাই দেখানো হবে।

মেহেরা বলেছেন, ফিল্মে অভিনয়ে আলির আগ্রহ আছে। পাকা কথা শীঘ্রই হবে। উল্লেখযোগ্য আলিকে এর আগে রুপোলী পর্দায় দেখা গেছে একাধিকবার ; কিন্তু তার বক্সার খ্যাতি থেকে ভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের কথা এই প্রথম শোনা যাচ্ছে।

এর নাম টেনিস

টেনিসের উঠতি তারকা ষোড়শী ট্রেসি অস্টিন ছ'মাসের খেলা থেকে মোট উপার্জন করেছেন প্রায় ১৯,০০,০০০ টাকা আর একটা স্পোর্টস কার।

হিমানীশ গোস্বামী ঃ দাবার আন্তর্জাতিক সংস্থা ফি ডে স্থির করেছেন আগামী বছর থেকে দাবার নোটেশন আর ডেসক্রিপটিভ থাকবে না, হবে অ্যালজেব্রেইক। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আর অযথা বর্ণনা দেওয়া হবে না, যতখানি সংক্ষেপে খেলার চালগুলিকে বোঝানো সম্ভব তাই করা হবে। আরও সহজ করার জন্য দাবার ছকের ৬৪টি ঘরের আলাদা আলাদা নম্বর দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই নম্বর বদলায় না। সাদার দিক থেকেই সবগুলো নম্বর দেখানো হয়েছে, কালোর দিক থেকে নয়। ডেসক্রিপটিভ অর্থাৎ বর্ণনা দিয়ে এখন যেমন বোঝানো হয়, আর অ্যালজেব্রেইক হচ্ছে বীজগাণিতিক। বীজগাণিতিক লেখার ধরন এখনই বহু জায়গায় চালু হয়ে গেছে। ফি ডে চালু করেছেনই, এছাড়া রক্ষণশীল দেশ বৃটেনের পত্রিকা বৃটিশ চেস ম্যাগাজিনও বীজগণিতের আশ্রয় নিয়েছে।

ধরা যাক, একটি রাস্তায় ৮টি বাড়ি রয়েছে, আর প্রত্যেকটি বাড়ি আটতলা উঁচু। বাড়িগুলি ইংরিজী অক্ষরে লেখা হয় এ বি সি ডি ই এফ জি এবং এইচ। লেখা হয় বাঁদিক থেকে ডান দিকে। তাহলে প্রথম বাড়িটিকে বলব এ, দ্বিতীয় বাড়িটিকে বলব বি, ঐইভাবে অষ্টম বাড়িটিকে বলা হবে এইচ। আরও জানা দরকার প্রত্যেকটি তলায় একটি করে ফ্ল্যাট আছে।

আমরা বাঙলায় লিখব ক খ গ ঘ চ ছ জ এবং ঝ। 'ঙ' বাদ দেওয়া হল খেলার এবং উচ্চারণের সুবিধের জন্য।

এবারে প্রত্যেকটি বাড়ির পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু আসলে প্রত্যেকটি বাড়ির প্রত্যেক ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানা চাই। তাহলে একতলার নিচের ফ্ল্যাটগুলির সবগুলির নম্বরই হবে ১। দোতলার ফ্ল্যাটগুলির নম্বর হবে ২, তিন তলার হবে ৩, এইভাবে ৮ তলা পর্যন্ত।

৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
২	২	২	২	২	২	২	২
১	১	১	১	১	১	১	১
ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ

এবারে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের আলাদা নম্বর হয়ে গেল। গ ৮ বলতে তৃতীয় লাইনের সবচেয়ে উঁচু অর্থাৎ ৮ তলার ফ্ল্যাটটি বোঝাবে।

কিস্তিমাত

দাবার ছকের উপর নম্বরগুলি সাধারণত লেখা থাকে না। দরকারও নেই। তবে ইচ্ছে করলে পাশাপাশি এই নম্বরগুলো লিখে রাখতে পারেন বুঝবার সুবিধের জন্য।

ছক দেখে এটা নিশ্চয় বোঝা যায় সাদা রাজার ঘর হচ্ছে চ ১। সাদা রাজার ঘরের বোড়ে সাজানোর সময় থাকে চ ২ তে। আর কালো রাজা বসে চ ৮-এ কালো রাজার সামনের বোড়ে বসে চ ৭-এ। খেলার শুরুতে যদি সাদার চাল হয় ১ বো—রা ৪, তাহলে সেটা বীজগাণিতিক উপায়ে লেখা হবে ১ চ ৪। বোড়ে চালালে বীজগাণিতিক লেখায় তার উল্লেখ করা হয় না। এর উত্তরে কালো যদি তার রাজার সামনের বোড়েকে দু ঘর এগিয়ে দেয় তাহলে এতদিন লেখা হয়েছে ১…বো—রা ৪। অর্থাৎ, কালোর দিক থেকে আলাদা হিসেব করে দেখানো হয়। কিন্তু বীজগাণিতিক বা নতুন নিয়মে লেখা হবে ১… চ৫। তাহলে দু'পক্ষের প্রথম চালটি এভাবে লেখা হবে ঃ ১ চ ৪, চ৫।

এবারে একটা সম্পূর্ণ খেলা বীজগাণিতিক উপায়ে কিভাবে লিখতে হয় দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে অবশ্য বিচরণমূলক লেখাও দেওয়া হচ্ছে। খেলাটি হয়েছিল বাংলাদেশের নতুন চ্যাম্পিয়ন প্রায় ১৩ বছর বয়সের নিয়াজ মুর্শেদের সঙ্গে রেজাউল হকের। ওই চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার ৫ম রাউণ্ডে এই খেলাটি হয়েছিল (ইংলিশ ওপেনিং)।

সাদা (নিয়াজ মুর্শেদ), কালো (রেজাউল হক)

১ গ ৪ (বো—মগ ৪) ঘো—ছ ৬ (ঘো—রা গ ৩);
২ ঘো—গ ৩ (ঘো—ম গ ৩), চ ৬ (বো—রা ৩);
৩ চ ৪ (বো—রা ৪), ঘ ৬ (বো—ম ৩);
৪ ঘ ৪ (বো—ম ৪), ঘো খ—ঘ ৭ (ঘো ১—ম ২);
৫ ঘো—ছ ৩ (ঘো--রা গ ৩) গ ৫ (বো—ম গ ৪);
৬ ঘ ৫ (বো—ম ৫), চ×ঘ ৫ (বো×বো);
৭ চ×ঘ ৫ (বো×বো), গ—চ ৭ (গ—রা ২);
৮ গ—ঘ ৩ (গ—ম ৩), ০০ (০০);
৯ ০০ (০০), ক ৬ (বো—ম রা ৩);
১০ নৌ—চ ১ (নৌ—রা ১), নৌ—চ ৮ (নৌ—রা ১);
১১ গ—ছ ৪ (গ—রা গ ৪), ঘো—ঝ ৫ (ঘো—রা নৌ ৪);
১২ গ×ঝ ৭+(গ×বো+), রা×ঝ ৭ (রা×গ);
১৩ ঘো—জ ৫+(ঘো—ঘো ৫+), গ×জ ৫ (গ×ঘো);
১৪ ম×ঝ ৫+(ম×ঘো+), গ—ঝ ৬ (গ—নৌ ৩);
১৫ গ×ঝ ৬ (গ×গ), ঘো—চ ৬ (ঘো—রা গ ৩);
১৬ নৌ×চ ৮ (নৌ×নৌ), ম×চ ৮ (ম×নৌ);
১৭ ম—ঝ ৪ (ম—নৌ ৪), জ×ঝ ৭ (বো×গ);
১৮ ম×ছ ৬ (ম×ঘো), খ ৫ (বো—ঘো ৪);
১৯ রা—ছ ১ (রা—গ ১), খ×গ ৪ (বো×বো);
২০ নৌ—চ ১ (নো—রা ১), ম—ছ ৮ (ম—গ ১);
২১ নৌ—চ ৭ (নৌ—রা ৭), রা—জ ৮ (রা—ঘো ১);
২২ ঘো—চ ৪ (ঘো—রা ৪) গ—ছ ৫ (গ—রা গ ৪);
২৩ ঘো×ঘ ৬ (ঘো×মবো), গ—জ ৬ (গ—ঘো ৩);
২৪ ছ ৪ (বো—গ ৪), ম—জ ৭ (ম—ঘো ২);
২৫ নৌ—চ ৮+(নৌ—রা ৮+), নৌ×চ ৮ (নৌ×নৌ);
২৬ ম×জ ৭+(ম×ম+), রা×জ ৭ (রা×ম);
২৭ ঘো×চ ৮+(ঘো×নৌ+), রা—ছ ৮ (রা—গ ১);
২৮ ঘো—ঘ ৬ (ঘো—ম ৬), রা—চ ৭ (রা—রা ২);
২৯ ঘো—খ ৭ (ঘো—ঘো ৭), রা—ঘ ৭ (রা—ম ২);
৩০ রা—ছ ২ (রা—গ ২), রা—গ ৭ (রা—গ ২);
৩১ ঘো—গ ৫ (ঘো×বো) ক ৫ (ম নৌ বো ৪); ৩২ রা—চ ৩ (রা—রা ৩),

এরপর কালোর পরাজয় স্বীকার। একই লাইনে ইংরিজী এবং বাংলা ছাপার ব্যবস্থা লাইনো টাইপে না থাকায় কম্পোজিং-এ গুরুতর অসুবিধে হয়। সেজন্য বাংলা ব্যবহার করা হল। ইংরিজীতে লেখার সময় অবশ্যই ক খ গ ঘ-এর পরিবর্তে এ বি সি ডি ইত্যাদি লেখা যাবে এবং দরকারও হবে। ●

(গত ১০ আগস্ট সংখ্যায় কিস্তিমাতের সঙ্গে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে তা ওই রচনার নয়। ওটা বর্তমান রচনায় প্রযোজ্য।)

বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল ঃ প্রস্তুতিপর্ব শেষ ধাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করে বর্ধমানে এখন সর্বত্রই সাজসাজ রব পড়ে গেছে। এই ধরনের জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বর্ধমানে বসছে এই প্রথম। অবশ্য এর আগে প্রি-এশিয়ান বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করে প্রচুর উৎসাহ ছিল সেখানকার দর্শকদের। কিন্তু এখন সে উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে এই বালক-বালিকাদের জাতীয় প্রতিযোগিতাকে নিয়েই। প্রতি-যোগিতার আর বিশেষ দেরী নেই। তাই সর্বত্রই কাজ চলছে দ্রুতলয়ে।

শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামের যেখানে আসন সংখ্যা ছিল ৪০০০ সেখানে পূর্বদিকে আর একটা কংক্রিট ব্লক বাড়িয়ে বর্তমান আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০০০ হাজার। ব্লকের সংলগ্ন একটি দ্বিতল ক্লাব হাউসও শেষ হওয়ার মুখে। ক্লাব হাউসের একতলায় সুন্দর অফিসঘর, মিটিং রুমের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ১৬টি বালক ও ১৬টি বালিকাদল অংশ নিচ্ছে এই প্রতিযোগিতায়। অবশ্য সব দলের এখনও কনফারমেশন পাওয়া যায়নি। নাম পাঠিয়েছে গুজরাট, রাজস্থান, ওড়িশা ও কেরালা দল। আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব রাজ্যদলের কাছ থেকে তাদের সম্মতির ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মোট খেলা হবে ৬৪টি।

খেলা চলবে সকাল ও সন্ধ্যায়। তবে সন্ধ্যার খেলাগুলি যাতে ৮টার মধ্যে শেষ হয় উদ্যোক্তারা সেই দিকেই নজর রাখছেন। খেলা-গুলি হবে প্রধানত স্টেডিয়ামের মধ্যে দুটি কোর্টে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে টাউন স্কুলের কোর্টও ব্যবহার করা হবে। নবনির্মিত বাস্কেটবল কোর্ট দুটি তৈরি করতে খরচ পড়লো ৪৪,০০০ টাকা, যার মধ্যে জেলাশাসক জে ভি আর প্রসাদরাও তার তহবিল থেকে দিয়েছেন ২৫,০০০ হাজার টাকা। হ্যালোজেন লাইটের ব্যবস্থা চলছে দুটো কোর্টেই। খরচ পড়বে ৫০,০০০ হাজার টাকা। তিনটে কোর্টেই ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতায় মোট খরচ ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। সম্প্রতি অ্যাকোমোডেশন কমিটির সভায় দলগুলির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বালকদের টাউন ও মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। বালিকাদের মিউনিসি-প্যাল গার্লস স্কুলে এবং রেফারি ও বি এফ আই কর্মকর্তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বর্ধমান হাউস, সারকিট হাউস প্রভৃতি স্থানে। প্রেস, রেডিও, টিভি-র জন্য ব্যবস্থা হয়েছে বাস অ্যাসোসিয়েসন গেস্ট হাউসে। বালক বালিকাদের থাকার যেখানে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে টিমগুলির যথেষ্ট সুবিধা হবে। কারণ দু'জায়গাতেই বাস্কেটবল বোর্ড থাকায় ওরা প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে। লোড-শেডিং-এর সমস্যা সর্বত্র। তাই উদ্যোক্তারা জেনারেটারের ব্যবস্থা করেছেন।

সিজন টিকিটে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তাদের জন্য সিজন টিকিটের হার করা হয়েছে মাত্র ৬ টাকা। তারপর ১০, ২৫ টাকা—যা এখন থেকেই বেশ কিছু বিক্রি হয়ে গেছে। উদ্যোক্তারা মনে করেন, সেপ্টেম্বর মাসেই টিকিটগুলো নিঃশেষিত হয়ে যাবে। ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার ৫৫০ খানা টিকিট—সমস্তই নির্ভর করছে পুশ সেলের উপর। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্ভবত উদ্বোধন করবেন এই জাতীয় প্রতিযোগিতার—৮ই অক্টোবর। সমাপ্তির দিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর পুরস্কার বিতরণ করার সম্ভবনা আছে রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং এর।

চীন, জাপান, কোরিয়া কলকাতায় বাস্কেটবল খেলতে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সম্ভবত কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দর্শকরা দেখতে পাবেন উচ্চ পর্যায়ের বেশকিছু বাস্কেটবল খেলা এই কলকাতায় ১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর। দশম এশীয় বাস্কেটবল খেলা হবে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। অংশ গ্রহণ করবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, বাহারিন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইরাক, পাকিস্তান ও ভারত। আরো দু-একটি দেশ অংশ নিতে পারে। এই টুর্নামেন্ট হংকং-এ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে হংকং এশিয়ান বাস্কেটবল কন্‌ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছে তাদের পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। কন্‌ফেডারেশনের কোরিয়ান সভাপতি জরুরী বৈঠক ডাকলেন কোথায় এই টুর্নামেন্টটা হবে। জাপান জানিয়েছিল তারাই করতে চায় টোকিওতে। এই টুর্না-মেন্টের গুরুত্ব অনেক। কারণ, শীর্ষস্থান দখলকারী দলটি সুযোগ পাবে ১৯৮০ সালে মস্কো ওলিম্পিকে খেলতে। ভারতও পাল্টা দাবি জানালো। তাদের দাবী ঃ ভারতেই করতে হবে এই প্রতিযোগিতা। কারণ এখানে একবারও এশীয় বাস্কেটবল প্রতি-যোগিতা হয়নি। এশীয়ান গেমস চার বছর পর হয়। কিন্তু এই এশীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা হয় এক বছর অন্তর। আবার ইউরোপ ও আমেরিকায় এই ধরনের প্রতি-যোগিতা হয় প্রতি বছরই। সভাপতি জানতে চাইলেন ভারতের কোথায় হবে এই খেলাগুলি। বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া কিছুদিন সময় চাইলেন। ২৮ জুলাই বোম্বেতে বি এফ আই এর জরুরী বৈঠক হয়ে গেল। দিল্লি ও রাজস্থান দাবি জানালো—তারাই করতে পারবে এই প্রতিযোগিতাটি। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল সংস্থা খুব জোরের সঙ্গে যুক্তি দেখালেন এই ধরনের প্রতিযোগিতা কলকাতায় হওয়া উচিত। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার আদর্শ জায়গা। অবশেষে কলকাতাই পেল সেই দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল সংস্থা রাজ্য সরকারের অনুমতি চাইলেন তাদের ১ আগস্টের চিঠিতে। এবং ১৫ লক্ষ টাকার একটি বাজেটও পেশ করা হল। সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেল। একটা মোটা অঙ্কের আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলেন তারা। এখন সবুজ সংকেত পাওয়া গেলে চীন, সাউথ কোরিয়া, জাপান ও ফিলিপিন গত নবম এশীয় বাস্কেটবলের প্রথম চারটি দল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করবে মস্কো ওলিম্পিকে কোয়ালিফাই করার জন্য।

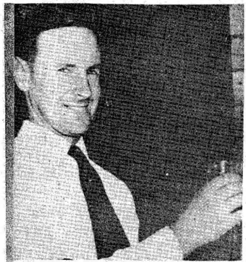
ম্যাসকট



বিভিন্ন রাজ্যের ৩২ জন শিল্পীর কাছ থেকে আসা ম্যাসকটগুলি পরীক্ষার পর সংগঠন সমিতির সকলেই একমত হয়ে সোদপুরের সঞ্জিত বসাকের ম্যাসকটটিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত করেন। তাকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে ১৪ অক্টোবর প্রতি-যোগিতার শেষদিনে।

এজবাস্টনের সেই টেস্ট ঃ
পিটার মে বনাম সোনি রামাধীন





পিটার মে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহামের এজবাস্টন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রথম টেস্টের খেলা অমীমাংসিত হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। আর যে কোন অমীমাংসিত খেলা মানুষের স্মৃতিপট থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুছে যায়। বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায় ওই খেলায় প্রধান নায়কদের ভূমিকা। যে খেলার পরিণতি হতে পারত চূড়ান্ত নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে, তার সমাপ্তি হল শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ফলাফলে।

কিন্তু ক্রিকেট রসিক যারা, বিশেষ করে যারা ওই টেস্ট ম্যাচটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারা সেদিন বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং এবং বোলিং দেখলেন। ওই নাটকের দুই প্রধান চরিত্র। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোনি রামাধীন এবং ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে। রামাধীনকে নিয়ে ভারতে অনেক আলোচনা হয়েছে। ক্রিকেট-রসিকরা তাকে ভারতের মাটিতে দেখেছেন। কিন্তু পিটার মে ভারতে আসেননি। যুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডে কাউড্রে, মে, ডেক্সটার ও জিওফ বয়কট স্বভাবত সৃজনশীল ও বনেদী ঘরানা ক্রিকেটের ধারক ও বাহক। ইংল্যাণ্ডের এবং বিশ্বের নানা দেশের ক্রিকেট সমালোচকরা ওই চারজনের মধ্যে পিটার মে-কে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রমের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। অথচ পিটার টেস্ট খেলা থেকে খুব তাড়াতাড়ি সরে আসেন এবং স্বেচ্ছায়। কিছু বিতর্ক পিটারকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

পিটার এজবাস্টন টেস্টের প্রসঙ্গে নিজে বলেছেন, ব্যাট করতে গিয়ে এত প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর কখনও সহ্য করতে হয়নি। ব্যাট করতে করতে মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, একটা ঝুঁকি নেব কিনা। অথচ ওই ঝুঁকি নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দলের বিপর্যয় রোধ করা যেত না—একথা অধিনায়ক পিটার জানতেন। আরও জানতেন, এক অপমানকর ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তিনি দলকে টেনে নিয়ে চলেছেন। পিটারকে সেদিন দুরকম লড়াই করতে হয়েছিল। উইকেটে দাঁড়িয়ে যেমন রামাধীনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে যাচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন কলিন কাউড্রে। আর মনের সঙ্গে পিটার লড়াই করেছেন প্রায় দুদিন ধরে যখন তার ব্যাট থেকে প্রতিটি স্ট্রোককে আগে ওজন করেছেন। ড্রাইভ করার আগে বিচার করেছেন পা বলের লাইনে নিখুঁতভাবে গিয়েছে কিনা। ব্যাটের হ্যাণ্ডেলে ধরা হাতের তালু এবং কব্জির মধ্যে দূরত্ব ঠিক রয়েছে কিনা আর ব্লক করার সময়ে ডান হাতের তালু ও কব্জি ঠিক সময়মত ব্যাটের হ্যাণ্ডেলের গোড়ায় নেমে আসছে কিনা। পুল করার সময়ে ডান পা-কে পেছনে সরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কতটা নিখুঁতভাবে পেছন দিকে নামিয়ে আনতে পারছেন সেটা বিচার করে বলকে লেগের দিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঞ্চ করে পাঠাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, রামাধীনকে একবারও কাট করবেন না। প্রতিটি বলের গুরুত্বকে ওজন করেছেন মারার আগে।

এত সবের প্রয়োজন হত না পিটার যদি না দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই একটি ভুল সট নিতে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতেন। ইংল্যাণ্ড হারত সেদিন। তবে পিটার এক ক্লান্তিহীন ও নিষ্করুণ পরিস্থিতি থেকে হয়ত মুক্তি পেতেন।

কিন্তু পিটারকে যারা দেখেছেন, তারা জানতেন, শান্ত, ধীর, স্থির এবং মনকে উইকেটের চার গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখে এমন লড়াই ইংল্যাণ্ডে আর কেউ পারেন না। বলতে গেলে পিটারই লড়াই-এর সূত্রপাত করলেন যখন প্রথম টেস্টের একদিন আগে দলকে নিয়ে এক নিভৃত ডিনারে বসলেন। এটাই চিরকালের প্রথা। অধিনায়কের সঙ্গে দলের সঙ্গীদের মন দেওয়া নেওয়া। সূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে অধিনায়কের আশা এবং প্রত্যাশা, সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপ—রেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। ওইদিন কিন্তু একটিমাত্র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোনি রামাধীনকে ধ্বংস করতে হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওই বেঁটে লোকটা ইংল্যাণ্ডের পথের কাঁটা। ওটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। ১৯৫০ সালের ইংল্যাণ্ড সফর থেকে এক অপরিচিত মুখ রামাধীন, সমানে হাড় মাস জালিয়ে অস্থির করে তুলেছে। প্রথম বারেই লর্ডসে দু'ইনিংসে ১০ ও ১১টি করে মেডেন ওভার করেছিলেন এক নাগাড়ে। উইকেট পেয়েছিলেন ১১টি। বোলারদের মধ্যে জাত-সাপ, এ বিষয়ে ইংরেজ ক্রিকেটারদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

সিদ্ধান্ত হয়ে গেল রামাধীনকে ধ্বংসের। পিটার পরদিন সকালে টসে জিতলেন। এজবাস্টনের উইকেটের অবস্থা চমৎকার। কিন্তু রামাধীন পিটারের হিসেবে এক গরমিলের ঝড় তুললেন। মনে হল ইংল্যাণ্ডে এর আগে এরকম সাংঘাতিক বল আর কেউ করেননি। একে এজবাস্টনের সাইট স্ক্রিন নেই, তার ওপর কালো রোমস হাতের তালুতে বল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কোন দিক দিয়ে মোচড় আসছে বলের ওপর কেউ ঠাওর করতে পারছেন না। দিনের বেলাই ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। রামাধীনের হাত থেকে হিশ্ হিশ্ করে বল আসছে। উইকেট পড়েছে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থায়। ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে ১৮৭ আউট (রামাধীন ৭/৪৯)।

প্রথম টেস্টের শুরুতেই এই অবস্থা! পরে কি হবে কেউ জানে না। সিরিজ হাতছাড়া হয়ে গেছে এরকম একটা অবস্থা। এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নেমে পিটিয়ে ছাতু করল বল। বৃহস্পতিবার খেলা শুরু হয়েছে। শনিবার লাঞ্চের পর অবস্থা দাঁড়াল ইংল্যাণ্ড ১৮৭, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪৭৪। শনিবার বিকেলে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। শেষ ঘণ্টায় রামাধীন পর পর দুটো ওভারে পিটার রিচার্ডসন এবং ডাগ ইনসোলকে আউট করে দিলেন। তিন নম্বর ব্রায়ান ক্লোজ ও চার নম্বর পিটার মে-রা যখন দিনের শেষে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তখন কোন সুস্থ লোকের পক্ষে—ইংল্যাণ্ড ম্যাচ বাঁচাতে পারবে কিনা এমন চিন্তা করা সম্ভব ছিল না।

পরের দিন রবিবার। খেলার ছুটি। শনি ও রবিবার রাত্রিবেলা পিটার ঘুমোতে পারলেন না। কমপক্ষে ২০০ রান করলে ইনিংস হার বাঁচানো যেতে পারে। খেলার বাকি দুদিন।

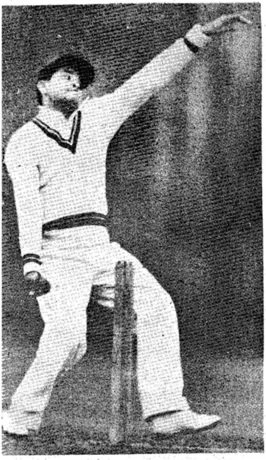
এমন একটা পরিস্থিতি অথচ পিটার তখন যাকে বলে মধ্যাহ্ন গগনে রয়েছেন। অসাধারণ ব্যাটসম্যান। যুদ্ধোত্তর টেস্টে অস্ট্রেলিয়া থেকে তার নেতৃত্বে অ্যাসেজ

পুনরুদ্ধার করেছে ইংল্যাণ্ড। ১৯৩৮ থেকে সারাটা যুদ্ধকাল অস্ট্রেলিয়ার দখলে ছিল।

পিটার জানতেন, প্রথম টেস্টে হারলে পরে কি হবে। এরপর চতুর্থদিনে (সোমবার) খেলা শুরু হওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে ব্রায়ান ক্লোজ আউট হয়ে গেলেন। কাউড্রে যখন এলেন, তখন পিটার হিসেব করে দেখলেন যে ট্রেভর বেইলি ছাড়া আর ব্যাটসম্যান বলতে কেউ নেই। সাত নম্বরে আছেন টনি লক। ঠিক ওই অবস্থায় পিটার গিয়ে কাউড্রের কানে কানে বললেন যে, আমি এখনও রামাধীনের বল ভাল করে বুঝতে পারছি না। মোচড়টা কোন দিক দিয়ে দিচ্ছে। তবে প্রতিটি বলই এগিয়ে খেলছি। মনে হচ্ছে এটা কাজ করছে। কাউড্রে ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন। অর্থাৎ অধিনায়ককে অনুসরণ করতে হবে।

খেলা শুরু হল। এবার কিন্তু রামাধীন শুধু বলই করছেন। উইকেট পড়ছে না। তার তূণে যত অস্ত্র ছিল, স্পিন, ফ্লাইট, ধাপ্পা, এগিয়ে এসে মারার জন্য খোশামদ এবং মাঝে মাঝেই হাড় জালানো বল করেও পিটারকে টলাতে পারলেন না। কলিন অন্যদিকে শুধুই বল আটকে যাচ্ছেন একরকম। মধ্যাহ্ন ও চা-এর বিরতি পার হয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ।

পিটার জানতেন, এখনও নিস্তার পাননি। অথচ তিনি নিজে একশ রান করেছেন।



সোনি রামাধীন

দর্শকরা ওই পরিস্থিতির জন্য তাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মাত্র। দলের রানের মধ্য দিয়ে কিছু আস্থার ভাব এসেছে। কিন্তু পিটারের মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কোথায় গেল তার মনমাতানো সব ড্রাইভ, হুক, পুল, কাট ও লেট কাট। স্কোর বুককে সন্ত্রস্ত করার জন্য প্যাভিলিয়নের ড্রেসিং রুমে সব স্ট্রোক জমা রেখে এসেছেন। মনের কথা কাউড্রেকে বললেন আর পারছি না এভাবে। কাউড্রে বোঝালেন যে আর কিছুক্ষণ এইভাবে চলুক।

কখন ডিক্লেয়ার করবেন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল পিটারের কাছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান সংখ্যার চেয়ে ৯০ রানে এগিয়ে গিয়েছে ইংল্যাণ্ড। পিটার ১৯৩ ও কাউড্রে ৭৮ ব্যাটিং।

পিটার তখন থেকে ভাবতে শুধু করলেন যে ডিক্লেয়ার কখন করবেন। ব্যাট করতে করতে হিসেব ঠিক হচ্ছে না। এমন সময় ডিক্লেয়ার করতে হবে যাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ম্যাচ জিতে নেওয়া সম্ভব না হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ডাগ ইনসোলকে বলে এলেন হিসেব ঠিক করে প্যাভিলিয়ন থেকে গুপ্ত ইঙ্গিত করতে। এধারে আম্পায়ারদের সঙ্গে পরামর্শ রান ও সময় নিয়ে। কিন্তু মন পড়ে আছে রামাধীনের বলের ওপর। স্থির দৃষ্টি নিয়ে দেখে যাচ্ছেন রামাধীনের মুখের দিকে। হতাশার কোন চিহ্ন আছে কিনা। চোখের দৃষ্টিতে ব্যর্থতা ধরা পড়ছে কিনা। রামাধীন কতটা মুষড়ে পড়েছেন ভেতরে ভেতরে। ধ্বংস হতে আর কতটুকু রয়েছে। পিটার এই সব করতে গিয়ে রান পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু ডিক্লেয়ার করার সময় ঠিক করার জন্য ডাগ ইনসোলকে যে ভার দিয়েছেন তা ভুলে গেলেন। প্যাভিলিয়নের দিকে একবারও মুখ তুলে তাকালেন না। সময় গড়িয়ে গিয়ে পিটারের যখন হুঁশ হল, তখন খেলা শেষ হতে আর আড়াই ঘণ্টা বাকি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জিততে হলে ২৯৬ রান করতে হবে। কাউড্রেকে নিয়ে পিটার হাঁটা দিলেন প্যাভিলিয়নে দিকে।

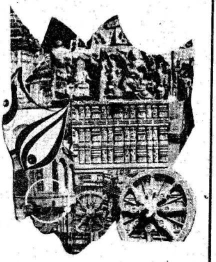
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ব্যাট করা শুরু করল তখন তারা চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারা তখন ধ্বংস। ট্রুম্যান, লক ও লেকাররা খেলা শেষ হওয়ার আগে ৭২ রানে সাতটি উইকেট নিয়েছেন। খেলা শেষ হয়ে গেল। পরদিন পিটারের বিপক্ষে সমালোচনায় ঝড় উঠেছিল আগে কেন ডিক্লেয়ার করেননি। যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু অন্য যুক্তিও দেওয়া যায়। পিটার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—রামাধীন ও সেই সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ধ্বংস করে দেব প্রথম টেস্টেই। ওই সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আরও একটি খেলা ড্র করেছিল। বাকি তিনটিতে হেরে যায়। চতুর্থ উইকেট জুটিতে মে কাউড্রে ৪১১ রান তুলে রেকর্ড করেন।

প্রথম টেস্টের আরও কিছু সংখ্যা তত্ত্ব দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। পিটার মে ২৮৫ ও কলিন কাউড্রে ১৫৪ অপরাজিত। রামাধীন দুই ইনিংসে মোট ১২৯ ওভার বল করেছিলেন। বল করার সংখ্যা ৭৭৪। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলায় জীবনের প্রথম টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি করেন। প্রথম শ্রেণী ক্রিকেটে মোট রান ২৭,৫৯২।

পিটার মে ভারতে না এলেও টেস্টে শেষ সেঞ্চুরিটি করেন ভারতেরই বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডে। পিটার টেস্ট ম্যাচে রান করেছেন ৪৫৩৭, টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা ৬৬, সেঞ্চুরি ১৩টি। শেষ টেস্ট খেলেছেন ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।

সোনি রামাধীন ১৫৮টি টেস্ট উইকেট পেয়েছেন।

● কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ তখন দারুণ জমজমাট। দু হাতে পয়সা লুটছে ইংরাজ কুঠিয়াল আর শেঠ-বেনিয়ার দল। নবাবের জন্মদিনে পথে-ঘাটে আতরই ঢালা হল বারো লাখ টাকার। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনে প্রেম-প্রতিহিংসা, চাওয়া-পাওয়ার নিত্যলীলা।.......বাংলার ইতিহাসের ব্রাত্যজনদের নিয়ে **অসীম রায়ের** এপিক উপন্যাস— **পলাশী কতদূর।** তথাকথিত শারদীয় উপন্যাস নয়; অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন-মথিত সুবিশাল স্বাদু কাহিনী। সযত্নে সংগ্রহ করে রাখার মত লেখা।



● দারুণ অ্যানটি-বাঙাল পরিবারের ছেলে মন দিয়ে ফেলেছে কট্টর বাঙাল ঘরের মেয়েকে। কর্তারা অনেক তর্জন-গর্জন করেও তাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারলেন না। শেষমেষ ঝামেলা বাঁধল অন্য জায়গায়—বিয়েটা হবে কোন মতে? তত্ত্ব ছাড়া ঘটি অচল; বাঙালেরা তালাশের কাঙাল। কী ঘটল শেষে? **নিবারণ চক্রবর্তীর** বিস্ফোরক লেখা— **ঘটি বাঙালের বিয়ে।**

শারদীয়া

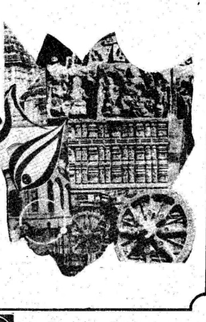
পরিবর্তন

১৩৮৬

● সুধীর চক্রবর্তীর কলমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুই সম্রাজ্ঞী কণিকা আর সুচিত্রার অন্তরঙ্গ আলেখ্য: কার কাছে ওরা গান শিখেছেন, কোন গান ওদের বেশি প্রিয়, রেডিও-টিভি-জলসা—কার কোনটা পছন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কী, ওদের যোগ্য উত্তরাধিকারী কে, ওরা কি অবসর নেবার কথা ভাবে ?

● ম্যাজিক করে ছেলে উচ্ছন্নে গেল— এই দুঃখ সারা জীবন বয়ে গেছেন পি সি সরকার সিনিয়রের বাবা। কিন্তু নিজে ম্যাজিসিয়ান হয়েও পি সি সরকার জুনিয়রের বাবা কি নিজে তাকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলেন? অসাধারণ আত্মজৈবনিক লেখা।

● দেবাসনময় পূর্ব ভারতের মন্দির-সংস্কৃতির এক সুচয়িত আলেখ্য। দক্ষিণেশ্বর, কামরূপ, চিত্রেশ্বরী, তারাপীঠ, হংসেশ্বরী—অতীত ও বর্তমান, কিংবদন্তী ও ইতিহাস, ভক্তি ও স্বার্থ-সিদ্ধির আকর্ষণীয় কথাচিত্র। অসংখ্য ছবি।



● ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উৎসবের চিত্ররূপময় বিবরণ। দক্ষিণ ভারতের 'পোঙ্গল', ওড়িশার 'রজঃ', আসামের 'রঙ্গালী বিহু', বিহারের 'ইঁদ', মুসলমানী পরব 'ঈদ-উল-ফিতর', সিকিমের বৌদ্ধ উৎসব 'পদ্মসম্ভব'।.

● একগুচ্ছ বাছাই-করা ছোটগল্প। দমফাটা হাসির গল্প ● হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, তেলেগু কবিতার অনুবাদ ● উপজাতি-জনজীবন ● গিরিশ কারনাডের একটি অনন্য প্রোফাইল।

পরিবর্তন

মানেই অন্য রকম

দাম মাত্র ছ টাকা

ইত্যাদি প্রকাশনী। কলকাতা-৭২



১৯৭৯-এ চতুর্থ ডিভিসন ফুটবলে রানার্স হোয়াইট বর্ডার দল। বাঁদিক থেকে পঞ্চম সম্পাদক অমিয় ব্যানার্জি, ষষ্ঠ সভাপতি বিচারপতি মানসনাথ রায়, সপ্তম কোষাধ্যক্ষ তারণ দাস।

হোয়াইট বর্ডার তৃতীয় ডিভিসনে উঠল

স্টাফ রিপোর্টার : হোয়াইট বর্ডার ক্লাব ১৯৬৩ থেকেই কলকাতার চতুর্থ ডিভিসনে খেলতে পারত। কিন্তু '১৯৬২ সালে তে বেঙ্গল সকার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যাদবপুর অগ্রগামীর সঙ্গে যে খেলাটি হওয়ার কথা ছিল সেটা নানা কারণে সম্ভব হয়নি। এরপর মামলা এবং শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ ১৯৬৫ সালের মে মাসে খেলাটির যে ব্যবস্থা করেন তাতে হোয়াইট বর্ডার ১-০ গোলে জয়ী হয়। ১৯৬৫ থেকে চতুর্থ ডিভিসনে এবং ১৯৭৪-এ রানার্স হওয়ার ফলে ১৯৭৫-এ তৃতীয় ডিভিসনে। তিন বছর তৃতীয় ডিভিসনে থাকার পর ১৯৭৮-এ অবনমন এবং এবছর রানার্স হয়ে আগামী বছর তৃতীয় ডিভিসনে আবার খেলবে।

১৯৫৭ সালে অ্যালেন লিগের রানার্স এবং পরে পর পর তিনবছর বেঙ্গল সকার লিগে চ্যাম্পিয়ন হলেও ওঠানামা বন্ধ থাকার দরুন আই এফ এ লিগে যোগ দিতে পারেনি।

হোয়াইট বর্ডার ক্রিকেট সি এ বি পরিচালিত প্রথম ডিভিসনের একটি দল।

কৃষ্ণনগরে রেফারিদের নিয়ে সমস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কৃষ্ণনগর—চলতি মরশুমে কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ফুটবল লিগ খেলার অনেকগুলিই রেফারির অভাবে বানচাল হতে চলেছে। বিশেষত বি ডিভিসনের খেলাগুলি কোন কোন দিন শুধুমাত্র রেফারির অভাবে সম্পন্ন হয়নি। কৃষ্ণনগর রেফারি এসোসিয়েশনের সম্পাদক রবেন মণ্ডল জানান যে, রেফারির সংখ্যা এত কমে গেছে, যে কোন দিন লিগ খেলাগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রচুর ক্ষোভ এবং দুঃখের সঙ্গে জানান, রেফারি এসোসিয়েশনের সদস্য কম নয়। তবুও মাত্র সাত-আট জন সিনিয়র রেফারি নিয়মিত মাঠে আসেন। অথচ প্রতিদিন পাঁচটি মাঠে তিনটি ডিভিসনের খেলায় পনের জন রেফারির প্রয়োজন। দুজন লাইন্সম্যান ও একজন রেফারি। কে আর এ এবিষয়ে কৃষ্ণনগর ক্রীড়া সংস্থাকে জানানো সত্বেও তারা কোনরকম দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।

খাতা কলমে রেফারির সংখ্যা কম না হলেও তারা মাঠে আসেন না। এর কারণ রেফারিরা তাদের সম্মানের দিকটা খতিয়ে দেখছেন। তাদের অভিযোগ, সারাবছর দর্শক ও ক্লাবগুলির গালাগাল সহ্য করে বিনা পারিশ্রমিকে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে যে শ্রমদান করেছেন পরিবর্তে তারা খেলা দেখারও কোনরকম সুযোগ পান না। তাছাড়া বিশেষ দু-একটি ক্রীড়া সংস্থার দুর্ব্যবহার সম্পর্কেও তাদের অভিযোগ আছে। রেফারিরা বলেছেন, আগে দুর্বিনীত সংস্থাগুলির বিচার হোক, তারপর দেখা যাবে।

কৃষ্ণনগর রেফারি অ্যাসোসিয়েশন এবছর ২৩ জন ছেলেকে রেফারি সংক্রান্ত পরীক্ষা দিইয়েছেন। তাদের ফল বের না হওয়া সত্বেও রেফারির অভাবে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যেহেতু তারা নবিশ, অতএব তাদের সামান্য ত্রুটিও খেলোয়াড়রা সহ্য করেন না। ফলে অপমানিত রেফারি পরের দিন মাঠে যান না।

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা রেফারিদের কোনরকম সাহায্য করেন না। নদীয়া রেফারি এসোসিয়েশনের বিমাতৃসুলভ আচরণে কৃষ্ণনগরের রেফারিরা ক্ষুব্ধ।

রেফারিদের যথাযোগ্য সম্মান, স্টেডিয়ামে নিয়মিত খেলা দেখার অধিকার, দুর্ব্যবহারকারী সংস্থার বিচার ইত্যাদি দাবী তুলে গত সাধারণ সভায় কৃষ্ণনগর রেফারি এসোসিয়েশন প্রস্তাবও নিয়েছে। জানা গেছে, নদীয়া জেলার ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ও কিছু প্রভাবশালী সদস্য নদীয়া রেফারি এসোসিয়েশনের সদস্য অথচ এরা কেউ খেলা পরিচালনা করতে পারেন না। দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে কে আর এ সম্পাদক জানালেন, যদি কোন দিন শোনা-যায় রেফারিরা মাঠে নামতে অস্বীকার করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু হবে না। ●

শারদীয়া 'খেলার আসরে'

অমিয় তরফদার

লিখেছেন—২৪ বছর আগে মস্কোয় খেলাধূলা কেমন ছিল।

'৭৯ দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবল লিগ তালিকা

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মির্জাপুর ইউনিয়ন—	১৮	১২	৬	০	২০	৪	৩০
ঐক্য সম্মিলনী—	১৮	৮	১০	০	২৪	১১	২৬
বেহালা ইয়ুথ—	১৮	৮	৭	৩	১৫	৮	২৩
বাটা স্পোর্টস ক্লাব—	১৮	৮	৬	৪	১৫	৭	২২
অনুশীলনী ক্লাব—	১৮	৭	৭	৪	১৯	৯	২১
বালি প্রতিভা—	১৮	৫	১১	২	১৬	১২	২১
টাউন ক্লাব—	১৮	৫	৯	৪	১৫	১৫	১৯
সিটি এ সি—	১৮	৬	৬	৬	১৩	১২	১৮
ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ক্লাব—	১৮	৫	৭	৬	২০	১৬	১৭
ইয়ং বেঙ্গল এ সি—	১৮	৪	৯	৫	১২	১৬	১৭
গ্রিয়ার স্পোর্টিং ক্লাব—	১৮	৩	১১	৪	১৬	১৪	১৭
বৌবাজার ইয়ং মেনস্ ইউনিয়ন—	১৮	৩	১১	৪	১০	১১	১৭
সাবার্বান ক্লাব—	১৮	৩	১১	৪	১১	১৪	১৭
মিলন সমিতি—	১৮	৩	১০	৫	১২	১৭	১৬
ভবানীপুর ক্লাব—	১৮	৩	১০	৫	৯	১৩	১৬
রবার্ট হার্ডসন—	১৮	২	১১	৫	৮	১৪	১৫
বেলেঘাটা এ সি—	১৮	৩	৮	৭	৯	১৬	১৪
অরোরা এ এ—	১৮	২	৮	৮	৯	১৯	১২
মেরি স্পোর্টিং—	১৮	০	৪	১৪	১	২৬	৪

'৭৯ তৃতীয় ডিভিসন ফুটবল লিগ তালিকা

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বড়িষা স্পোর্টিং ক্লাব—	১৬	৯	৫	২	১৮	৯	২৩
সোনালী শিবির—	১৬	৮	৬	২	১৭	৬	২২
তালতলা ইনস্টিটিউট—	১৬	৭	৬	৩	১০	৬	২০
কালিঘাট ফ্রেণ্ডস ক্লাব—	১৬	৭	৫	৪	১২	৭	১৯
অ্যালবার্ট স্পোর্টিং ক্লাব—	১৬	৬	৬	৪	১২	৮	১৮
হাওড়া টাউন ক্লাব—	১৬	৫	৬	৫	১৩	১১	১৬
কালিঘাট মিলন সংঘ—	১৬	৫	৬	৫	৮	১১	১৬
ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব—	১৬	৩	১০	৩	১১	১২	১৬
কালিঘাট মিলনী ক্লাব—	১৬	৫	৫	৬	১৫	১৭	১৫
ইউনাইটেড স্টুডেণ্টস ক্লাব—	১৬	৫	৫	৬	১০	১৪	১৫
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব—	১৬	৫	৫	৬	৯	১১	১৫
বেনিয়াটোলা ক্লাব—	১৬	৪	৭	৫	১১	১৩	১৫
সাদার্ন সমিতি—	১৬	৪	৭	৫	৮	৭	১৫
শ্যামবাজার ইউনাইটেড ক্লাব—	১৬	২	১১	৩	৮	৯	১৫
উত্তরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব—	১৬	৪	৫	৭	৭	১২	১৩
জোড়াবাগান ক্লাব—	১৬	৩	৬	৭	১১	১৪	১২
ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাব—	১৬	০	৭	৯	৫	১৮	৭



শারদীয়া 'খেলার আসরে'

অতুল মুখার্জি

লিখেছেন—ওলিম্পিক গেমস মানব সভ্যতাকে কি দিয়েছে। সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য ছবি—এদেশের কোন পত্রিকায় বের হয়নি।

মুর্শিদাবাদে দীর্ঘতম সাঁতার

মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর। যোগদানের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর। সংস্থার কার্যালয়—ফকীর ঘাট লেন, পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ।

আদ্রায় সোমেন দেব ফুটবল লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় বর্ষ সোমেন দেব স্মৃতি শিল্ড ফুটবলে আদ্রা সেরসা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। লিগ ভিত্তিতে খেলানো এই প্রতিযোগিতায় সেরসা ৬টি খেলায় প্রতিটিতে জয়ী হয়ে ১২ পয়েণ্ট পেয়েছে। রানার্স এস এফ এ'র প্রাপ্ত পয়েণ্ট ৯। এবারের প্রতিযোগিতায় সাতটি দল অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় একমাত্র হ্যাটট্রিক করেছে কমলা স্পোর্টিং-এর আয়ুব খান। আদ্রা সেরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই লিগ ফুটবলের উদ্যোক্তা ছিল বিজয় সংঘ। ১২ আগস্ট পুরস্কার বিতরণ করেন আদ্রার ডিভিসনাল সুপারিনটেনডেণ্ট ইকবাল সিং সান্ধু। বিজয়ী সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পেল সোমেন দেব স্মৃতি শিল্ড ও রানার্স এস এফ এ পেল অমরনাথ দাস স্মৃতি শিল্ড।

শারদীয়া 'খেলার আসরে'

চুনী গোস্বামী

লিখেছেন—তিনিও শুরুতে যা ভাবেননি, তাই-ই হয়েছে লিগে। কিন্তু কেন?

খেলার আসর পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে ১৪ সেপ্টেম্বর

মানস ভট্টাচার্য কিভাবে এগিয়ে চলেছে

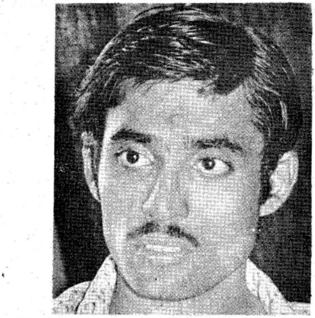
হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ ৭৬-এর লিগ। পর পর সাতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন-প্রত্যাশী ইস্টবেঙ্গলের সেটা ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ম্যাচ। খেলা এরিয়ানের সঙ্গে। প্রথমার্ধটা গোলশূন্য কাটল। দ্বিতীয়ার্ধের তখন মাঝামাঝি সময়। এরিয়ানের একজন খেলোয়াড় ডান দিকে একটা বল বাড়িয়ে দিল। বল ধরল দলের রাইট আউট। বলটা ধরেই বলাই চক্রবর্তীকে সে গতিতে হারাল, অশোক ব্যানার্জি ও শ্যামল ঘোষকে পিছনে ফেলল দ্রুত ডজ করে। এবং এক ঝলকে বুঝতে পারল সুধীর কর্মকার তাকে বাধা দিতে ছুটে আসছে। গোলরক্ষক তরুণ বসুও তখন বিপদের গন্ধ পেয়ে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে গোল ছেড়ে। এইটাই মোক্ষম সময়, সে অনুভব করল। এবং ত্বরিৎ বলটা সে জালে পাঠাল তরুণকে ধোঁকা দিয়ে। এক গোলে এগিয়ে গেল এরিয়ান। খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গল-জনতা মুহ্যমান হলেও একযোগে খেলোয়াড়টির বুদ্ধিমত্তার তারিফ করল। কিছুক্ষণ বাদে অনু চৌধুরী ইস্টবেঙ্গলর পক্ষে গোলটা শোধ করল। কিন্তু আরও একটি গোল দিয়ে সেদিনের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল আর এগিয়ে যেতে পারল না। খেলা ১—১ ড্র থাকল। ইস্টবেঙ্গল নষ্ট করল প্রথম পয়েন্ট। বলাবাহুল্য, গোলদাতা রাইট আউটের নাম মানস ভট্টাচার্য।

মানসের নামটি ময়দানে তখন উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। এ দিন সে বিশেষভাবে চিহ্নিত হল। ওর প্রথম ডিভিসন ফুটবল শুরু ৭৩-এ ক্যালকাটা জিমখানার হয়ে। এবং ফুটবল জীবনের শুরুতেই একটা মনে রাখার মত কাজ মানস করেছে। মোহনবাগান সেবারের লিগে প্রথম ম্যাচটি ক্যালকাটা জিমখানার সঙ্গে ১—১ অমীমাংসিত রেখেছিল। জিমখানার হয়ে মোহনবাগান জালে বল ঢুকিয়েছিল মানস। এরপর সে অনেক গোল দিয়েছে, দেবেও। কিন্তু সে দিনের দেওয়া গোলটার কথা অবশ্যই সে ভুলবে না। ৭৭-এর লিগ চলাকালীন কারোর পক্ষে ধরে নিতে কোন অসুবিধা হল না—আগামী মরশুমে মানস বড় টিমে যাচ্ছেই। এবং গেলও।

৭৭-এ মানস পা রাখল পালতোলা নৌকোয়। লিগটা শুরু করল ভালোই। খেলতেও লাগল বেশ। মাঝখানে আফগানিস্তান সফরকারী ভারতীয় দলে ও নির্বাচিত হল। তাই লিগে ওর অনুপস্থিতি ঘটল। যখন ফিরে এল, লিগ তখন প্রায় শেষ। যে গুটি কয় খেলা বাকি ছিল, তাতে খেলল। তারপর বরদলুই, শিল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স—সব ক'টা প্রতিযোগিতায় প্রায় নিয়মিতই খেলল মানস। চারটি ট্রফিই ঘরে তুলল মোহনবাগান। মানসের নামের পাশে বেশ কয়েকটি গোলও লেখা হল। কারুরই কোন সন্দেহ রইল না, ও ময়দান মাতাবে।

কিন্তু ৭৮-এর ফেডারেশন কাপে ওর গতিময় ফুটবল জীবনে হঠাৎ একটা ঝাপটা এসে লাগল। মোহনবাগান আই টি আই-য়ের দ্বিতীয় লেগ সেমি-ফাইনালে কোমরে চোট লাগল ওর। এবং এই ইনজ্যুরি নিয়েই ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ফাইনাল খেলল।

ফেডারেশন কাপ খেলে টিম ফিরে এল। এদিকে ওর আঘাতের জায়গায় মাঝে মাঝেই একটা ব্যথা চাগিয়ে উঠত, বিশেষ করে শোবার সময়। ওই অবস্থাতেই টিমের সঙ্গে ফার-ইস্ট ট্যুরে গেল মানস। ওখানে মালয়েশিয়ার অন্যতম সেরা টিমের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই কাদা মাঠে তিনটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করল সে। কেন এমন হল, সেটা ও নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। এবার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদেশ বসুকে সব খুলে বলল ও। বন্ধু আশ্বস্ত করল।



মানস ভাবল গরম জল-টল লাগালেই ব্যথাটা সেরে যাবে। অর্থাৎ ব্যাপারটা উপেক্ষা করে গেল। অতঃপর ফার-ইস্ট ট্যুর শেষ করে দলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এল। এবং তারপর ও কোচ পি কে-কে সব ঘটনা খুলে জানাল। এবার মানসকে চলে যেতে হল ইনজিওরড লিস্টে। মাঠে রেগুলার আসত, কিন্তু প্র্যাকটিস নিতে পারত না। চোট পাওয়া জায়গার ব্যথা উপশম করতে ব্যস্ত হল ও। মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার শঙ্কর ব্যানার্জির প্রেরণা ও সহায়তায় সেরে উঠল মানস। একসময় ফিটও হল। ৭৮-এর লিগে কয়েকটি ম্যাচ মানস খেলেছে এবং প্রতি খেলাতেই দলের পক্ষে একাধিক গোল করেছে। লিগের অধিকাংশ ম্যাচেই অবশ্য সুভাষ ভৌমিক খেলেছে দক্ষতার সঙ্গে।

৭৯-এর লিগ জয়ের ঠিক আগের দিন (রবিবার) প্র্যাকটিসের পর একটি আলাদা ঘরে খালি গায়ে সর্টস পরা মানস সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। বলল ঃ 'জানেন, '৭৩ থেকে কলকাতার লিগে আমাকে মাঠের বাইরে বিশেষ বসতে হয়নি। তাই গতবছরের লিগে অধিকাংশ ম্যাচে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকায় মনটা খুব খারাপ লেগেছিল, যদিও ভোম্বলদা (সুভাষ ভৌমিক) ভাল খেলছিলেন। একটা হতাশা ও শূন্যতাবোধ ঘিরে ধরত আমাকে। অনুশোচনা করতাম, আঘাতকে কেন গুরুত্ব দিইনি। তবে লাইনের ধারে বসলেও আমি কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি। দৃঢ় ধারনা ছিল, সুযোগ আসবেই। সেই মতই মনকে প্রস্তুত করেছিলাম; যাতে সুযোগ এলে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারি। একটাই বাসনাই ছিল আমার—মাঠে নেমে ভোম্বলদার (সুভাষ ভৌমিক) চেয়ে ভালো খেলতে হবে। ভোম্বলদাও তাই বলতেন—দেখ, মাঠে নেমে এমন খেলা খেলবি, যাতে পাবলিক বলতে পারে—মানস সুভাষের চেয়ে ভালো খেলছে। উৎসাহিত করতেন হাবিবদাও। আর প্রদীপদা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনে মগ্ন করিয়েছেন আমাকে। খেটেছি আমিও। উদ্দেশ্য ছিল, মাঠে নেমে যাতে ব্যর্থ না হই।'

শিল্ডে মানস ফিরে এল। এবং ব্যর্থ তো হয়ইনি, এইখান থেকেই মানস নতুন করে দর্শকদের চোখ টানল ওর প্রতি। শিল্ডে দারুণ খেলল ও। এবং মোটামুটি তখন থেকেই মোহনবাগান গ্যালারি মানসকে নিয়ে উৎফুল্ল হল।

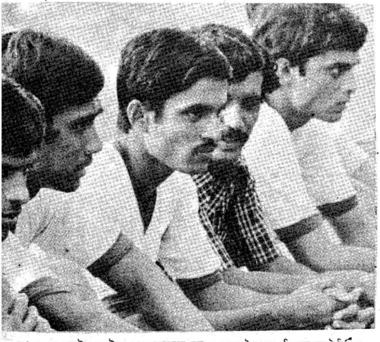
আর এবার? এবার মানস তুখোড় ও দুরন্ত হয়ে উঠল, বিপক্ষ ডিফেন্সের কাছে নিজেকে প্রতিপন্ন করল অপ্রতিরোধ্য আক্রমণকারী

হিসাবে। কথাটা সত্যি, এবারের লিগে সুরজিত যেমন সাব্বিরের গোল করার পথ খুলে দিয়েছে বার বার, তেমনি মোহনবাগানের মধ্য মাঠের সেনাপতি গৌতম সরকারও মানসকে বল সরবরাহ করেছে অক্লান্তভাবে। তবু মানসের কৃতিত্ব নিজেও সে এবার অনেক গোল বানিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ডিফেন্সকে কেটেছে, ভেঙ্গেছে। রাইট আউট থেকে চকিতে কাট করে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। এবং গোল করেছে। গোল করেই ঘুরে গিয়ে হাত দুটো উপরে তুলে লাফাতে লাফাতে ও লম্বা ছুট লাগিয়েছে। ২৪ বছরের ছটফটে ও সরল যুবকটির মুখ থেকে ঝরে পড়েছে উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি।

মানস এবার মোহনবাগান গ্যালারিকে উদ্বেল করেছে, সম্মোহিত রেখেছে। বল নিয়ে যখনই ও এ‌ঁকেবেঁকে বিপক্ষ ডিফেন্সে ঘা মেরেছে, মোহনবাগান-জনতা গর্জন করেছে ‘গো অ্যাহেড মানস!’ গোল চাই। মানস গোল দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে আকাশ কাঁপানো চিৎকার। সুরজিত যেমন তার গতি, অনবদ্য স্কিল এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অবলীলায় বিপক্ষ ডিফেন্সকে ফালাফালা করে কাটে মানসও এবার তেমনভাবে বিপক্ষের ডিফেণ্ডিং জোনকে টালমাটাল করেছে। করেছে ছত্রভঙ্গ।

৭ জুলাইয়ের সেই অতি মূল্যবান গোল সম্পর্কে মানস কি বলে? ওর মুখ থেকেই শোনা যাক: ‘সেদিনের গোল সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আমার মন চলে যাচ্ছে তার কয়েক মাস আগের একটি ঘটনায়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ৭৮-এর ডুরাণ্ড ফাইনাল। ইস্টবেঙ্গল তখন এক গোলে এগিয়ে। এমন সময় আমি একটা সহজ গোলের সুযোগ হারালাম। টিম এক গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ওই সুযোগের অপচয় যদি না ঘটাতাম, তাহলে মোহনবাগানকে ওই ম্যাচে হয়তো তিন গোলে হারতে হত না। সিনিয়র প্লেয়াররা সেদিন আমায় বকেছিলেন (ওই বকাই আমার পক্ষে আশীর্বাদের কাজ করেছে)—‘তুই কেন এই চান্স মিস্ করলি। জানিস তো, এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুযোগ কম আসে।’ তখন থেকেই একটা অপরাধ বোধ আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কুরে কুরে খেয়েছে। একটা একগুঁয়েমি ভাব আমার মনটাকে বদ্ধপরিকর করে দিল। ঠিক করলাম—ইস্টবেঙ্গলকে গোল দেবই, অবশ্যই যদি সুযোগ পাই।

সুযোগ এল অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। আসলে চিন্ময় বলটা ধরে যেই নিজের গোলের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, অমনি আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম—বলটা ও ব্যাকপাস করবে, কালবিলম্ব



’৭৮-এ, সাইড লাইনে বসে সন্তোষ বসু, কম্পটন দত্ত, চিন্ময় চ্যাটার্জি ও শিবাজী ব্যানার্জির সঙ্গে খেলা দেখছে মানস / অরুণ মুখার্জি

না করে দৌড়তে শুরু করলাম। ভাস্করও তীব্র বেগে ছুটে আসছিল। হাওয়ায় বলটা একটু নড়ে এবং শ্লথ হয়। তবু ভাবলাম, অল্পের জন্য বলটা হয়তো পাব না। যেকোন কারণেই হোক, হয়তো মুখ তুলে আমাকে একটু দেখবার জন্যই ভাস্কর সামান্য স্লো হয়ে যায়। আমি মরিয়া হয়ে বলটা পুশ করি। গড়িয়ে গড়িয়ে বল গোলে ঢোকে।’

‘এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা আমার হয়তো সমীচীন হবে না। তবু বলি—একজন স্টপারের গোল লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল। চিন্ময় ব্যাক পাসটা নাও করতে পারত। তবে আমার ধারণায়—ও আমাকে দেখতে পায়নি। আর দেখুন, একজন ভুল করে বলেই তো আর একজন সুযোগ পায়। ভুল মানুষ মাত্রই করে এবং খেলোয়াড়ও। আমি শুধু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র। ৭৮-এর ডুরাণ্ডে যা হারিয়েছিলাম, ৭ জুলাই তা ফিরে পেলাম। পূর্ণচিত্তে সেদিন মাঠ ছেড়েছি। ৭ জুলাই দিনটি মনে রাখব, অবশ্যই।

মানস কখন গোলটা করেছিল? প্রথমার্ধ শেষ হবার অল্প একটু আগে। ইস্টবেঙ্গল তখন এক গোলে এগিয়ে, প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে মোহনবাগানের উপর এবং আরও গোল হতে পারে—এই অবস্থায় গোল শোধ করে মানস ইস্টবেঙ্গলের থাবা থেকে ম্যাচটি বার করে আনে। খেলার যা গতিবিধি ছিল তাতে মনে হয়, ওইসময় গোলটি শোধ না হলে মোহনবাগানের পক্ষে উত্তরপর্বে খেলায় ফিরে আসা এবং ইস্টবেঙ্গলের মুঠি থেকে ম্যাচ বার করা অত্যন্ত কঠিন হত। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই চিন্ময়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাক পাসটাই ওকে গোল করার সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপর? —তারপর মানস যে ক্ষিপ্রগতি, বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রাখল, সেটাও কোন অংশে কম প্রশংসার নয়। ওর সেই মরীয়া প্রচেষ্টার দৃশ্যটা কি চট করে ভোলা যায়? সেদিনের ওই গোল এবং গোলদাতা মানস দলের লিগ জয়ের পথে অনবদ্য ভূমিকা রেখে গেছে।

মানসের মতে—খেলোয়াড়ের কাছে গোল দেওয়াটাই সবচেয়ে আনন্দের। ’৭৩ থেকে লিগে এ পর্যন্ত মানস কম গোল দেয়নি। তার মধ্যে কোনটি সেরা? প্রশ্নটা শুনে মানস একটু থমকাল। পড়া মুখস্ত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন কোন ছাত্র যেমন থেমে থেমে উত্তর দেয়, তেমনি মানসও সেরা গোলটির খোঁজে মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগল এবং ভেবে চিন্তে বলল—গতবারে শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান আরারাত ম্যাচের গোল, গতবারের বাংলা-গোয়া সন্তোষ ট্রফি ফাইনালের গোল ইত্যাদি। তারপরই দ্বিধাহীন চিত্তে মানস উত্তর দিল। উত্তরটা নিজের সিদ্ধান্তের নয়, কোচ পি কে-র মানস বলছে—‘প্রদীপদা বলেন, এবারের লিগে ক্যালকাটা জিমখানার বিপক্ষে দেওয়া গোলটিই আমার সেরা।’ কেমন করে সেটা হল? মানসের জবানীতে—‘আমাদের এরিয়া থেকে শ্যাম থাপার সঙ্গে খেলে বল নিয়ে এগিয়ে গেলাম বিপক্ষ অঞ্চলে। তারপর দ্রুত কাট করে ভিতরে ঢুকে এলাম। এবং সট। বল ঢুকে গেল গোলে।’

যখন ক্যালকাটা জিমখানায় ছিল, যখন এরিয়ানে ছিল—তখন দলের পক্ষে মানসের নামের পাশেই লেখা থাকত সর্বোচ্চ গোল। আর মোহনবাগানে তিন বছর হলেও এবারই মানস নিয়মিত খেলল। আর শুধু দলের পক্ষেই নয়, সাব্বিরের সঙ্গে ও ৭৯-এর লিগের যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরবও পেল। দুজনের গোলের সংখ্যাই ২৩। সাব্বির সাড়ে তিনটি ম্যাচ খেলেনি, এটা জেনেই বলছি, আউটের খেলোয়াড় হিসাবে ২৩টি গোল দেওয়া মানসের পক্ষে অবশ্যই কৃতিত্বের। সুভাষ ভৌমিকও আউটের প্লেয়ার হিসাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার শিরোপা পেয়েছিল ৭৩ সালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ২৪টি গোল দিয়ে। মানসের গোল সংখ্যা তার চেয়ে একটি কম। তবে সুভাষ সেবার কিছু ম্যাচ রাইট ইন বা স্ট্রাইকারের জায়গায় খেলেছিল।

যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব পাওয়ায় মানস খুশী। আর খুশী



মানস গোলে সট নেবার পূর্ব মুহূর্তে / অরুণ মুখার্জি

গো-ও-ল / পাহাড়ী



প্রকাশ করতে গিয়ে এই সম্মান পাওয়ার পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী বলে সে মনে করে, সেই গৌতম সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ও ভোলে না। গৌতম ওর আদর্শ প্লেয়ার। এবং একালের সেরা ডিফেণ্ডার হিসাবে ও মনে করে সুধীর কর্মকারকে, আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় রূপে সুরজিত সেনগুপ্তকে। আর ওর কাছে সর্বকালের সেরা ভারতীয় খেলোয়াড় হলেন পি কে।

মানস দুবার জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাঙলার হয়ে খেলেছে, একবার এশীয় যুব ফুটবলে ভারতের হয়ে। সিনিয়র জাতীয় ফুটবলে পর পর তিনবার ও বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এরপর আরও বহবে—বাঙলার, ভারতেরও। ছেলের এই সাফল্যে বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সকলেই আনন্দিত। গর্বিতও।

মানস গান শুনতে ভালোবাসে, পছন্দ করে অ্যাকশন সিনেমা দেখতে। লেখাপড়াতেও ও খুব ভাল ছিল—ডিস্টিংশন নিয়ে বি এস সি পাশ করেছে। ওর আজকের এই উত্থান ও সাফল্যের পিছনে আগাগোড়া সর্বাধিক উৎসাহ এবং সহায়তা দিয়ে এসেছেন শঙ্কর ব্যানার্জি—মোহনবাগান, বাঙলা এবং ভারতের হয়েও যিনি একসময় খেলেছেন এবং এখনও প্রথম ডিভিসন ফুটবলে মাঠে নামেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে। শঙ্কর একসময় বাটানগরের হিরো ছিলেন, আজ হিরো মানস।

মানস প্র্যাকটিসের দিন খুব ভোরে ট্রেনে চেপে কলকাতায় আসে। খেলার দিন একটা নাগাদ অফিস থেকে সোজা চলে আসে টেন্টে। (সেই ৭৩ থেকে খেলার দিন ও একই জামা-প্যাণ্ট পরে মাঠে আসে)। ফাঁকা টেন্টে দুপুরে একটা ঘুম দিয়ে নেয় ও। তারপর সময় হলে, একে একে সহ-খেলোয়াড়রা এলে, উঠে ড্রেস করে মাঠে খেলতে যায়।

মানসকে অভিনন্দন জানাতেই ও প্রাণখোলা হাসি হাসে। তারপরেই সহজ ও সরল ভাবে বলে—'সেরা গোলদাতার গৌরব যেমন পেয়েছি, মিসও তো করেছি। জানি, আমায় আরও ভাল খেলতে হবে। আমি সেই চেষ্টাই করব।'

রাজহরাতে জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্ট

রাজহরা থেকে গাজী এম আনসার ঃ রাজহরা মাইনস শহরে এ মরশুমের তৃতীয় জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্ট জুলাই-এর মাঝামাঝি নাগাদ শুরু হয়। ১৭ বছরের নীচের বয়সী ছেলেরাই এতে অংশগ্রহণ করে। ডাবল লিগ প্রথায় মোট আটটি ফুটবল ক্লাব যোগ দেয়। এর মধ্যে ডায়নামো, রেডস্টার, সিইরা ক্লাব, ডার্ক আইস, ইয়ং বয়েজ প্রভৃতি প্রধান।

প্রথম সেমিফাইনালে ডায়নামো ক্লাব ২-০ গোলে ইয়ং বয়েজ ক্লাবকে হারায় এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও ডায়নামো ক্লাব ৩-১ গোলে জেতে।

ওদিকে প্রথম সেমিফাইনালে রেডস্টার ও স্কাইল্যাব-এর খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রেডস্টার ৩-০ গোলে জেতে। ফাইনালে ডায়নামো ক্লাব রেডস্টারকে ২-০ গোলে হারিয়ে ট্রফি পায়।

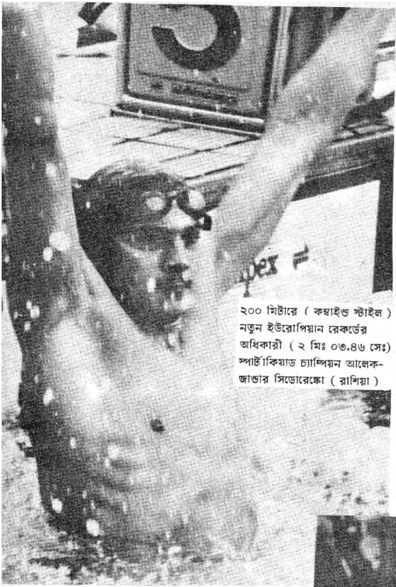
ডায়নামো ক্লাবের টি এস মাদ্রি তিনটি হ্যাটট্রিক করে এবং টুর্নামেন্টের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিবেচিত হয়েছে। রাজহরা হাইস্কুলের ক্লাস এইটের ছেলে মাদ্রি স্কুল এবং ক্লাবের হয়ে ইতিপূর্বে খাণ্ডোয়াতে খেলেছে। ১৯৭৮-এ ক্লাবের হয়ে ও কোটনাতে খেলে বেশ নাম কিনেছে। অল ইণ্ডিয়া জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্টে চান্দোয়াতে খেলেছে। রেডস্টার ক্লাবের চুন্নু দাস শ্রেষ্ঠ গোলকিপার বিবেচিত হয়েছে।

খেলার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন রাজহরা মাইনস ম্যানেজার এম এল গুপ্তা। রাজহরা ফুটবলের কোচ তথা ভিলাই স্টিলের স্পোর্টস অফিসার সুজয় ঘোষ টুর্নামেন্ট সংগঠিত করেন।

অনেকেই আমাদের প্রতিনিধি নন

কিছুদিন ধরে আমাদের দপ্তরে নানারকম অভিযোগ এসে পৌঁছচ্ছে—'খেলার আসরের' প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার এই পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা, খেলোয়াড়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে হাজির হচ্ছেন সংবাদ সংগ্রহের আশায়, ছবি তোলার জন্যও। 'খেলার আসরের' সঙ্গে অনেক লেখক ও সাংবাদিক নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই তারা পরিচিত হলেও তাদের আমরা পরিচয়পত্র দিয়েছি কাজের সুবিধের জন্য। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকলে অন্য কথা। কিন্তু অপরিচিত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের কাছে আমাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইবেন।

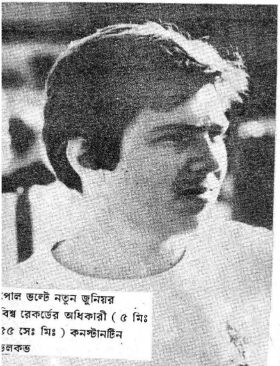
—সম্পাদক



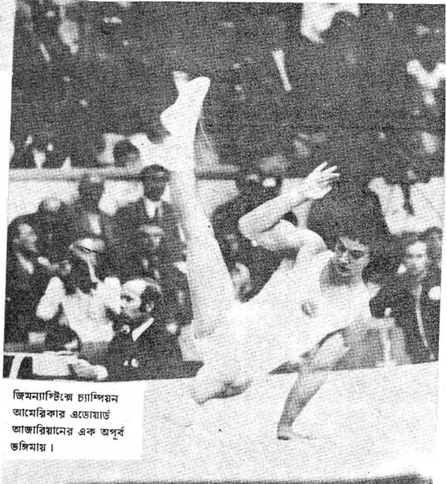
২০০ মিটারে (কম্বাইণ্ড স্টাইল) নতুন ইউরোপিয়ান রেকর্ডের অধিকারী (২ মিঃ ০৩.৪৬ সেঃ) স্পার্টাকিয়াড চ্যাম্পিয়ন আলেক-জাণ্ডার সিডোরেঙ্কো (রাশিয়া)



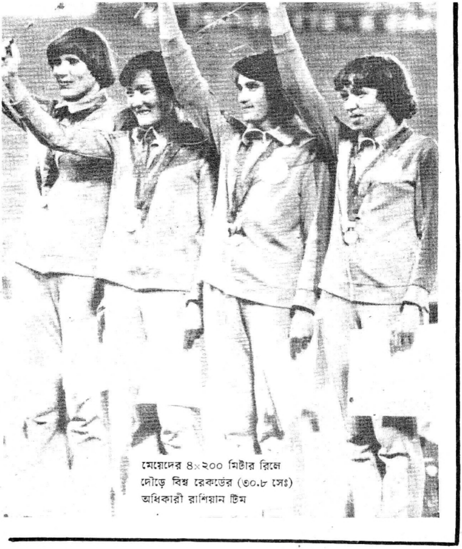
বুলগেরিয়ার নমিয়া মোটৈতা শুটিং-এ চ্যাম্পিয়ন।



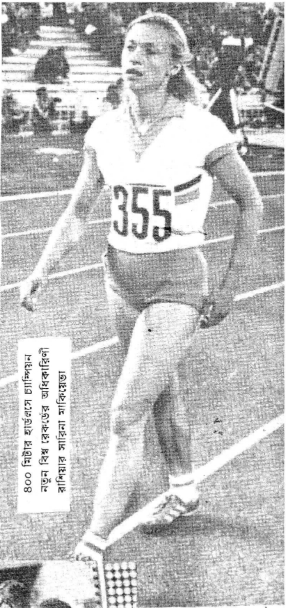
পোল ভল্টে নতুন জুনিয়র বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী (৫ মিঃ ৫৫ সেঃ মিঃ) কনস্টানটিন ভলকভ



জিমন্যাস্টিক্সে চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার এডোয়ার্ড আজারিয়ানের এক অপূর্ব ভঙ্গিমায়।



মেয়েদের ৪×২০০ মিটার রিলে দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের (৩০.৮ সেঃ) অধিকারী রাশিয়ান টিম



৪০০ মিটার হার্ডলসে চ্যাম্পিয়ন নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী রাশিয়ার মারিনা মাকিয়েভা

সপ্তম স্পার্টাকিয়াডের চ্যাম্পিয়নরা



সপ্তম স্পার্টাকিয়াডে ৫ হাজার ও ১০ হাজার মিটারে চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার মিরুসি একটার।

আই এফ এ শিল্ড

প্রিয় সম্পাদক,

কলকাতার আই এফ এ শিল্ড নাকি খুব পুরনো ট্রফি। সারা ভারতে তো বটেই, বিদেশেও নাকি একসময়ে এর খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি এখন এমন জলুষহীন কেন? আসামের বরদলুই ফুটবল প্রতিযোগিতাতেও বিদেশী ভাল ভাল দল আসে। কয়েক বছর আগেও আই এফ এ শিল্ডে নামী বিদেশী দল আসত। এখন আসে না কেন? কেউ কেউ বলে বৃষ্টির সিজনে কলকাতায় বিদেশীরা খেলতে চায় না, ভারতের অন্যান্য ভাল টিমও আসে না একই কারণে! কথাগুলো কি সত্যি? কলকাতা তো বৃষ্টিতে আগেও এরকম হত। তখন তো অনেক দল আসত শুনেছি। কেউ কেউ বলে কলকাতা থেকে আই এফ এ শিল্ড জিতে বাইরে নেওয়া দুঃসাধ্য। সত্যিই কি? এ যদি সত্যি হয় তা হলে তো কেউ আসবে না! আমার মতে কলকাতা সম্পর্কে এইসব মিথ্যে ধারণা যাতে না হয় এমন কিছু করা উচিত।

ব্রতীন রায় (১৩)
সাঁইপালা, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।



উঠছে যারা

তৃতীয় হ্যাটট্রিক লজ্জার ব্যাপার

আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। ইস্টবেঙ্গল লিগ পায়নি, তবুও এটি আমার প্রিয় ক্লাব। কিন্তু এবার একটি ঘটনা আমার খুব খারাপ লেগেছে। মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ ড্র নিয়ে মন খারাপ হয়নি। তবে মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে তারা গোল করতে না পারাটা লজ্জার। সমরেশদাকে বাহবা জানাবো—তিনি যেভাবে লড়েছিলেন সেদিন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল শেষ খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে কি করল। ৩-৩ ড্র হয় কেমন করে? এটা কি ধরনের ফুটবল? সাব্বিরদাকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করানোর জন্য অমন করা কেন? এতে ফুটবলের মান বাড়বে কি? আমি আমার মোহনবাগান সাপোর্টার বন্ধুদের সামনে লজ্জায় কথা বলতে পারছিনা।

নির্মল ঘোষ (১৪)
বোড়াল, ২৪ পরগণা।



মহমেডান স্পোর্টিং : স্পোর্টিং ইউনিয়ন
খেলার একটি মুহূর্ত / পাহাড়ী রায়চৌধুরী

ভাবছো কেন

দাদা তুমি ভাবছো বসে কি?
এ বছর লিগ পাইনি
তাইতে হয়েছে কি।
শিল্ডটা এখন রয়েছে বাকি
চেষ্টা করেও আর পাবে না
সন্দেহটা রয়েছে নাকি?

টিনা ঘোষ (১৩)
কলকাতা-৪



মহমেডান স্পোর্টিং : স্পোর্টিং ইউনিয়ন

আমি স্পোর্টিং ইউনিয়নের একজন গোঁড়া সাপোর্টার। আমার কাকা স্পোর্টিং ইউনিয়নের কর্মকর্তা। সে সূত্রে আমি একটি ডে-স্লিপ পেয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। প্রথমে মাঠে ঢুকেই দেখলাম স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড়রা অনুশীলন করছে। কয়েক মিনিট পরে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে নামল। খেলা আরম্ভ হল চারটে সতের মিনিটে। প্রথমার্ধের শেষে গোল করার আগে পর্যন্ত মহমেডান ফরোয়ার্ডরা বিপক্ষ ডিফেন্সের পাঁচ ব্যাকের পায়ে বারবার বল জমা দিয়ে গেছে। সুইপার হিসেবে এই সময় নিশীথ শ্রীমানি নির্ভরশীল ছিল। মাঝ মাঠে বল ধরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ফরোয়ার্ডরা হাফ ব্যাকদের উঠে আসার অপেক্ষায় অযথা সময় নষ্ট করেছে। মহমেডান দুটি গোল করেছে চমৎকার। গোল দুটি ছাড়া তাদের খেলায় আর কিছু চোখে পড়েনি। গৌরাঙ্গ ওভারল্যাপ করে উঠে প্রায় গোল লাইন থেকে সেণ্টার করলে অমলরাজ পড়ন্ত বলে ভলি মারে। ডিফেণ্ডারদের ভিড়ের মাঝে দাঁড়ানো হাবিব সেই বলে মাথা ছুঁইয়ে গোলে পাঠায়। অমলরাজের শট গোলকিপার সঞ্জয়ের হাতে লেগে গোলে ঢোকে। মহমেডান স্পোর্টিং-য়ের মধ্যে ভাল খেলেছিল সুভাষ রায়, সমরেশ, হাবিব। স্পোর্টিং ইউনিয়নের মধ্যে খেলেছিল সুব্রত গুই, নিশীথ শ্রীমানি, সুবীর লাহিড়ী ও পরিমল দাস।

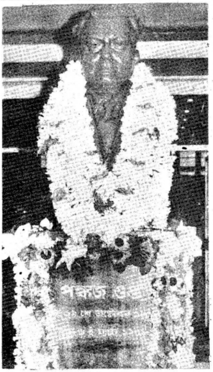
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (১২)
সপ্তম শ্রেণী, সাউথ সুবার্বান ব্রাঞ্চ স্কুল, কলকাতা-৪০।

·খেলার মাঠে মৃত্যুঞ্জয়ী পঙ্কজ গুপ্ত

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বিশ দশকের কোন এক তারিখে পঙ্কজ গুপ্ত ইডেন উদ্যান দখলের জন্য অভিযানের সূচনা করেছিলেন। ভারত ও বাংলার ক্রীড়া-জগত তখন শাসক জাতি ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠীর হাতে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট এবং সমগ্র ক্রীড়া-জগতে ভারতীয়রা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আলাদা ক্লাব, আলাদা মাঠ, মাঝে মাঝে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দেখা হয় খেলার মাঠে। ইডেন উদ্যান তখন ভারতীয়দের কাছে নিষিদ্ধ উদ্যান, বিশেষ ম্যাচ খেলা ছাড়া। সি এ বি ও আই এফ এ-র কর্তৃত্ব পুরোপুরি শাসকদের হাতে। বাংলার ও ভারতের ক্রীড়াজগত দখলের সূচনা হয়েছিল ১৯২৪ সালে যখন সম্পূর্ণ বাঙালীদের নিয়ে গঠিত একটি ফুটবল দল জাভা (ইন্দোনেশিয়া) ভ্রমণ করে আসে। ওই ঐতিহাসিক দলের সংগঠক ও সহকারী ম্যানেজার ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত। কিন্তু দলের ম্যানেজার এফ এ বি রসার। অধিকাংশ সদস্য ছিলেন মোহনবাগান দলের।

পঙ্কজ গুপ্ত তখন ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবের অন্যতম সদস্য। ঢাকা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের রেফারি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরাজী লেখা ও বলায় দুরন্ত এক তরুণ। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়েছে। হকি ও ফুটবলের সঙ্গে নাড়ীর যোগ আম্পায়ারিং ও রেফারিং-এর সূত্রে। কলকাতায় বাইটন কাপের ফাইনালে প্রথম ভারতীয় আম্পায়ার পঙ্কজ গুপ্ত। ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার জাভা ভ্রমণকারী ভারতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার। ১৯২৬-এ ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ফুটবল খেলায় (ইণ্টারন্যাশনাল) প্রথম রেফারি। ১৯৩০ সালে আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের প্রথম ভারতীয় রেফারি, ১৯৩২ সালে লস্ অ্যাঞ্জেলসে প্রথম ভারতীয় আম্পায়ার, ১৯৩৬ সালে বার্লিন ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন, ১৯৪৮ সালের লণ্ডন ওলিম্পিকে হকি দলের ম্যানেজার ও হেলসিঙ্কি (১৯৫২) জুরি অব অ্যাপিলের সদস্য। শুরু থেকে ভারতীয় হকি দলের বিজয় অভিযানের এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগঠক, সহযোদ্ধা ও সহযাত্রী।

১৯৩০-১৯৩৭ ইংরাজী দৈনিক অ্যাডভান্সের ক্রীড়া সম্পাদক, ১৯৩৭-১৯৫৬ অমৃতবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক এবং পূর্বাঞ্চলে মাদ্রাজ হিন্দু পত্রিকায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ক্রীড়া সংবাদদাতার কাজ করেছেন।



পঙ্কজ গুপ্ত—শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি / শঙ্কর নাগ দাস

১৯৪৪ সালে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের ভারতীয়—করণের পর প্রথম ভারতীয় সম্পাদক, ইডেনে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৪৬-৪৭ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক, সহ-সভাপতি (১৯৫২-৫৬)। ইংল্যাণ্ড (১৯৪৬) ও অস্ট্রেলিয়া (১৯৪৭) ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার। ১৯২৮ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিশ্ব ওলিম্পিকে পঙ্কজ গুপ্ত হাজির। ভারতে এমন কোন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা ছিল না যার সঙ্গে পঙ্কজ গুপ্তের যোগ ছিল না। ইণ্ডিয়ান ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং টেবল টেনিস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি হয়েছেন। মৃত্যু ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। ইডেনে আসার পথেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। আর তার চেতনা ফেরেনি।

দীর্ঘ চলার পথ শেষ হল ১৯ আগস্ট ১৯৭৯, যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ইডেন উদ্যানে রঞ্জি স্টেডিয়ামের পাশে নব-নির্মিত ভারতের বৃহত্তম আচ্ছাদিত ক্রিকেট কোচিং কেন্দ্রের সামনে স্থাপিত পঙ্কজ গুপ্তের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। ওই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মণীন্দ্র দত্ত রায়, ধীরেন দে, চন্দ্রভূষণ চ্যাটার্জি, সহধর্মিনী বাসনা গুপ্তা এবং অজস্র গুণমুগ্ধ অনুগামী ও সহকর্মীরা। পঙ্কজ গুপ্ত মেমোরিয়াল স্মৃতি কমিটির উদ্যোগে এই মর্মর মূর্তি নির্মাণ করেছেন সুনীল পাল। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান ও সি এ বি-র সভাপতি স্নেহাংশু আচার্য মর্মর মূর্তিতে মালা দেন। মালা দিয়েছিলেন শ্রীমতী বাসনা গুপ্তাও।

বাংলার ক্রিকেটারদের সামনে এখন অনেক সুযোগ

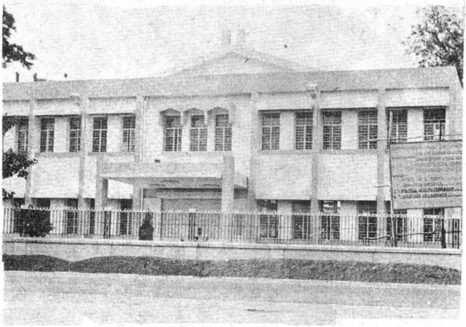
বিশেষ প্রতিনিধিঃ ইডেনে আচ্ছাদিত ক্রিকেট কোচিং কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীবসুর উৎসাহে নির্মিত কোচিং সেণ্টার ইডেন উদ্যানের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নবতম সংযোজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রটি নির্মানের জন্য ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন এবং আরও তিন লক্ষ টাকা বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামে ব্যয় করা হয়েছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের ব্যবস্থাপনায় এখানে কংক্রিটের ওপর অ্যাস্ট্রো টার্ফ ঢাকা তিনটি পিচের ওপর সারা বছর এবং সারাদিনের মত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। আস্ট্রো টার্ফ এবং ফাস্ট বোলিং-এর মেশিনের জন্য বিদেশে অর্ডার গিয়েছে।

সি এ বি সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত জানান, স্কুল, কলেজ, রঞ্জি ট্রফি ও রাজ্যের উঠতি খেলোয়াড়রা ছাড়া মেয়েদেরও অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত হলটিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু ও পূর্তমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তী বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে আচ্ছাদিত অনুশীলন কেন্দ্র খেলার মানোন্নয়নের যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ফুটবল খেলার সময় মাঠের গণ্ডগোল উল্লেখ করে বলেন, সামান্য কিছু অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত লোক যেভাবে মাঠের আবহাওয়া কলুষিত করছেন সেটা বন্ধ হতে পারে একমাত্র সংগঠিত জনমতের চাপের ফলে।

অনুশীলন কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে বাংলার তিন টেস্ট ক্রিকেটার সুঁটে ব্যানার্জি, মণ্টু ব্যানার্জি ও পঙ্কজ রায়, বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য টেস্ট খেলোয়াড় দাত্তু ফাদকার ছাড়া রঞ্জি ট্রফির প্রাক্তন ও বর্তমানের বহু খেলোয়াড়, বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠক আম্পায়াররা উপস্থিত ছিলেন।

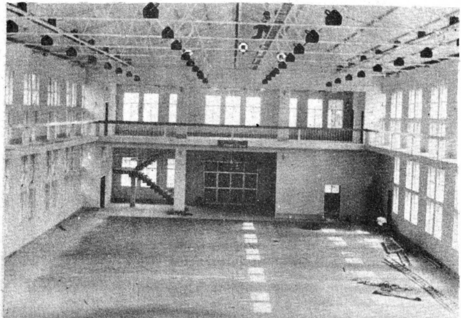
ক্রিকেট অনুশীলন কেন্দ্র,বাইরে থেকে / শঙ্কর নাগ দাস



প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘ দিনের এক অভাব দূর হল এবং কেন্দ্রটি তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। শ্রীরায় বলেন বাংলার স্বল্পসময়-স্থায়ী ক্রিকেট মরশুমের জন্য ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরির পথে যে বাধা ছিল এখন সেটা দূর হল। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও দীর্ঘ বর্ষার পর বাংলায় যখন ক্রিকেট খেলা শুরু হয় তখন ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রে অনেক আগেই দলীপ ট্রফি, রঞ্জি ট্রফি শুরু হয়েছে এবং অনেক রাজ্যেই সারা বছর ক্রিকেট মরশুম চালু থাকে। বাংলার ছেলেরা অনুশীলন করতে করতে যখন মানসিক ভারসাম্য ও শারীরিক দক্ষতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাল ব্যাট, বল ও ফিল্ডিং করছে তখনই মরশুম শেষ হয়ে যায়। এই কেন্দ্র সারা বছর অনুশীলনের যে অভাব ছিল সেটা দূর করে দিল। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা থেকে খেলোয়াড়রা টেস্টে খেলতে পারবে বলে শ্রীরায় দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

মণ্টু ব্যানার্জি বলেন, কেন্দ্রটি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার তৈরি হওয়ার পক্ষে এক আদর্শ স্থান। কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গটি একটা বড় সমস্যা যেন না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।





অনুশীলন কেন্দ্রের ভিতরটা এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয় / শঙ্কর

ভারোত্তোলন !

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়



ভারোত্তোলন করছে প্যালা,—
আয়, দেখে যা কেমন ;
পারবি নাকি তুলতে ওজন—
কায়দা করে এমন !

কম-সম নয়,—'হেভী ওয়েট',—
হোক না যতই ভারী ;
প্যালা বলে, ইচ্ছে হলে,—
তুলতে সবই পারি !

নামকরা এক পালোয়ানের
ছিলাম প্রধান চ্যালা ;
ভাবিস নাকো হেলাফেলা !
শোনায় হেঁকে প্যালা।

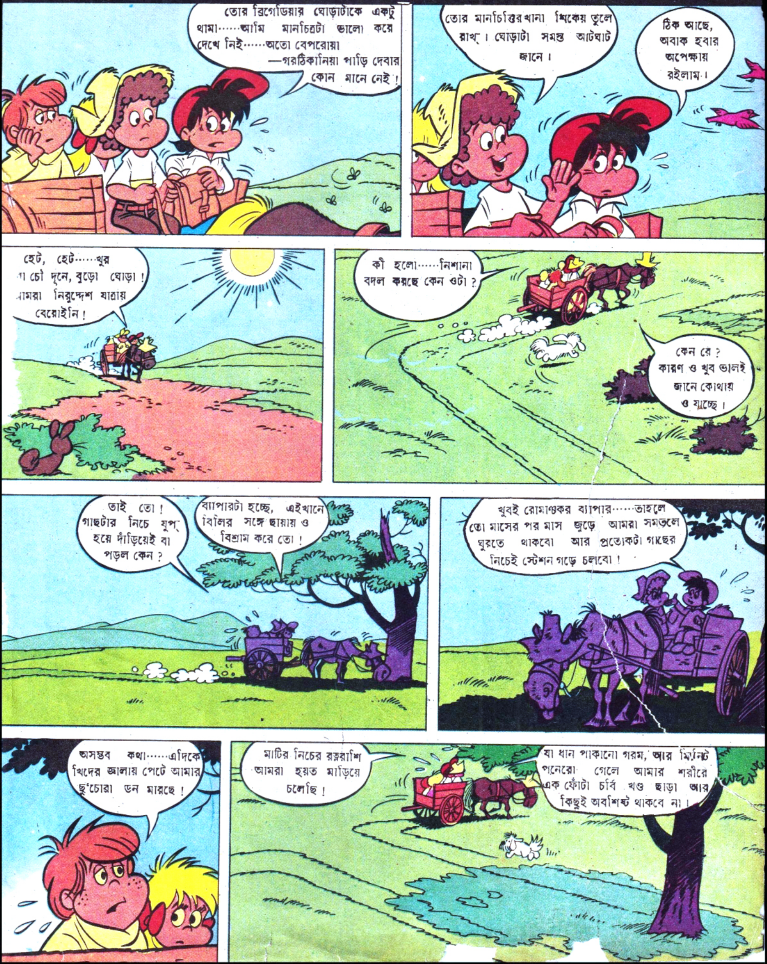
'এতদিনের জোর সাধনায়
পারছি নিজে এটা ;—
নাম করে, ঠিক এই লাইনেই
হবোই রে কেউকেটা !'

'ঠাট্টা করে সবাই বলে,—
তেইশ ইঞ্চি ছাতি ;
এই ছাতিতেই, দেখিয়ে দেব,—
তুম্ববো কাঁধে হাতি !'

মুদ্রক ও প্রকাশক : অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি
... ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাও
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত



..on No. 30198/77 KHELAR AASAR 31st • August 1979 WB/CC—334/77 Rs. 1.50



প্রতাপ ঘোষ/পাহাড়ী রায়চৌধুরী